কক্সবাজার এর পর্যটন সম্ভাবনা ও সমস্যা

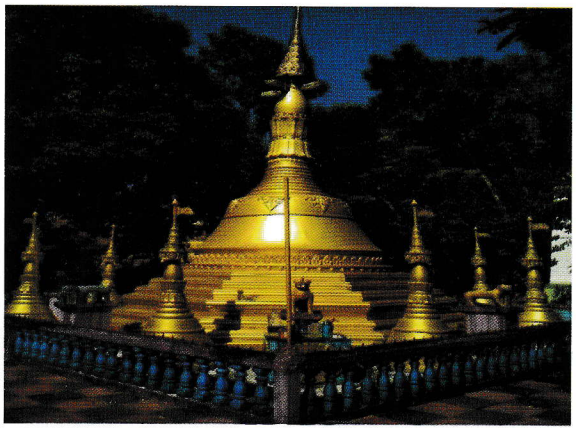

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিসের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কক্সবাজার এর পর্যটন সম্ভাবনা ও সমস্যা" শীর্ষক গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সম্মানীত পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক এর সহযোগীতা ও দিকনির্দেশনায় কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এ গবেষণা কাজে পরিচালক মহোদয়ের অবদান কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি। এ গবেষণা কর্মকান্ড সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তার উৎসাহ ও প্রেরণা সাহস যুগিয়েছে।

গবেষণা বিষয়ে KII(Key Informant Interview), ফিল্ড সার্ভে তে প্রয়োজনী তথ্য ও মতামত দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলার বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিট্রেট, ট্যুরিস্ট পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার, উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার(ভূমি) জনাব মো এবং জনাব তানভীর হাসান রেজাউল, ডেপুটি টাউন প্ল্যানার, কউক এর কাছে গবেষণা বিষয়ে সহযোগীতা করার জন্য। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিসের গবেষণা সহকারী জনাব ক্যালভিন চাকমা, রেখাকার জনাব এ কে এম বদরুল আলম, অফিস সহকারী জনাব সাদ্দাম হোসেন, অফিস সহায়ক জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, শিকল বাহক জনাব আবুল বাশার মিয়ার প্রতি যারা সার্ভে ও অন্যান্য কাজে সহযোগীতা করেছেন। উল্লেখিত সকলের প্রতি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সার সংক্ষেপ

কক্সবাজার শহরকে বলা হয় পর্যটন নগরী। এই অভিধাটি যতটা আমাদের আকাঙ্খার মধ্যে আছে, ততটা বাস্তবে নেই। বাংলাদেশের জন্য কক্সবাজার প্রকৃতির এক অনন্য-সাধারণ উপহার। সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়-জঙ্গালে ঘেরা কক্সবাজারের নয়নাভিরাম দৃশ্যের কোনো তুলনাই হয় না। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান এখানেই। সমুদ্র সৈকতের কোল ঘেঁষে কক্সবাজার শহরকে পর্যটন নগরী হিসেবে এবং গোটা কক্সবাজার এলাকাকে সম্ভাবনার আলোকে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা হয়ে উঠতে পারে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ লাইফ লাইন। কক্সবাজারে প্রায় ৫০ এর অধিক পর্যটন স্থান আছে। এসব স্থানের মধো সর্বোচ্চ ২০ টি স্থানে ট্যুরিস্টদের যাতায়াত রয়েছে। পর্যটন স্থানগলিতে অনেক সমস্যা বিদ্যমান আছে যেমন নিরাপত্তা সমস্যা, বর্জ্য ববস্থাপনার অভাব, প্রচার প্রচারণার অভাব, পর্যটন স্থানে দালাল, ক্যামেরাম্যান, বীচ বাইকার, হিজড়া, হকার ইত্যাদি শ্রেনীর উৎপাত, অধিকাংশ হোটেল এ ভাড়া নির্ধারণ না হওয়া, খাবার হোটেল গুলোতে ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ, যোগাযোগ অবকাঠামোর সমস্যা, যানবাহনের সমস্যা ইত্যাদি। শিল্প-অর্থনীতির ব্যাপক সম্ভাবনা কক্সবাজারে রয়েছে। কক্সবাজার এর উপর এদিকে এতদিন সেভাবে নজর দেয়া না হলেও বর্তমান সরকারের আমলে কক্সবাজারের সার্বিক উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, যার বাস্তবায়ন এখন জোর কদমে চলছে। পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজার শহরকে সাজানোর সর্বমুখী প্রস্তুতি চলছে। একই সঙ্গে অন্যান্য এলাকার উন্নয়নেও নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্র সৈকতকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প থেকে অনেক দেশের অর্থনীতিতে বড় অংকের অর্থের যোগান আসে। কক্সবাজারের পর্যটন শিল্প থেকেও দেশের অর্থনীতিতে কিছু অর্থ আসে বটে, তবে তা সম্ভাবনার তুলনায় খুব বেশি নয়। কক্সবাজারের পর্যটন শিল্প থেকে অর্থের প্রবাহ বাড়াতে সৈকতের উন্নয়নসহ অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিকল্প নেই। সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজার শহরের প্রতিষ্ঠাসহ সমগ্র কক্সবাজারের চেহারা পাল্টে যাবে। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই একটা নয়া দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে। দেশ ও দেশের মানুষ এর সুফল ভোগ করবে। আমরা উন্নয়নের এই রোড ম্যাপের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i
	সার সংক্ষেপ	ii
	সূচিপত্র	iii
	মানচিত্র	iv
	ছবির তালিকা	iv-vi
	অধ্যায়-০১ঃ ভূমিকা	
১.১	পটভূমি	০১
১.২	অবস্থান ও আয়তনঃ	০২
১.৩	যৌক্তিকতা	০২
১.৪	গবেষণা এলাকাঃ	০২
১.৫	গবেষনার উদ্দেশ্যঃ	০২
১.৬	সীমাবদ্ধতাঃ	০২
	অধ্যায়-০২: কক্সবাজার	
২.০	কক্সবাজার	০৩
২.১	কক্সবাজার এর পর্যটন সম্ভবনাঃ	০৪
	অধ্যায়-০৩: . কক্সবাজারের পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থান সমূহের তালিকা ও সমস্যা	
৩.১	কক্সবাজার সদরঃ	০৫
৩.১.১	পৃথিবীর সর্ববৃহত সমুদ্র সৈকত	০৭
৩.১.২	অগ্ন মেধা ক্যাং(কক্সবাজার পৌরসভা)	০৯
৩.১.৩	বার্মিজ মার্কেট:	১০
৩.১.৪	ঝিনুক মার্কেট:	১১
৩.১.৫	রাডার স্টেশন	১১
৩.১.৬	হিলটপ সার্কিট হাউজ	১২
৩.১.৭	ছাচি চৌধুরীর মসজিদ	১৩
৩.১.৮	মেরিন ড্রাইভ	১৩
৩.১.৯	নাজিরার টেক শুটকি পল্লী	১৪
৩.১.১০	দরিয়ানগর পার্ক	১৫
৩.১.১১	ফিশারী ঘাট/ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র:	১৬

৩.১.১২	লবণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা:	১৭
৩.১.১৩	ঐতিহ্য লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর	১৭
৩.১.১৪	রেডিয়্যান্ট ফিসওয়াল্ড	১৮
৩.২.১।	হিমছড়ি	১৮
৩.২.২।	রামু রাবার বাগান	১৯
৩.২.৩।	ক্যাপ্টেন কক্সের বাড়ীঃ	১৯
৩.২.৪।	কক্সবাজার বোটানিক্যাল গার্ডেনঃ	২১
৩.২.৫।	রামকুট তীর্থধামঃ	২২
৩.২.৬।	রাংকুট বৌদ্ধ মন্দিরঃ	২৩
৩.২.৮।	লাওয়ে জাদি (প্যাগোডা)	২৪
৩.২.৯।	ভূবনশান্তি ১০০ ফুট সিংহ শয্যা গৌতম বুদ্ধ মূর্তি	২৪
৩.২.১০।	কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার, রামুঃ	২৫
৩.২.১১।	মেরংলোয়া বিহারঃ	২৬
৩.২.১২	কানা রাজার সুড়ংগঃ	২৭
৩.৩.১।	ডুলাহাজরা সাফারী পার্ক	২৭
৩.৩.২।	বীর কমলার দিঘী	২৮
৩.৩.৩।	ফজল কিউকের মসজিদ	২৯
৩.৩.৪।	মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	২৯
৩.৩,৫	ফাসিয়াখালী জাতীয় উদ্যান	৩০
৩.৪.১।	আদিনাথ মন্দির(মহেশখালী)	৩১
৩.৪.২।	সোনাদ্বীয়া দ্বীপ	৩২
৩.৪.৩।	বড় রাখাইন পাড়া বৌদ্ধ মন্দির	৩৩
৩.৪.৪।	আদীনাথ মন্দির জেটি ঘাট	৩৪
৩.৫.১।	ইনানী বিচ	৩৪
৩.৫.২।	পাটুয়ারটেক পাথুরে বীচ	৩৫
৩.৬,১।	কুতুবদিয়া বাতিঘর:	৩৬
৩.৬.২	বায়ু বিদ্যুতঃ	৩৭
৩.৬.৩	কুতুবদিয়া সমূদ্র সৈকতঃ	৩৮
৩.৭.১।	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	৩৮
৩.৭.২।	মাথিনের কুপ	৩৯

৩.৭.৩।	শাহপরীর দ্বীপ (টেকনাফ)	৪০
৩.৭.৪।	টেকনাফ ট্রানজিট পয়েন্ট জেটিঘাট	৪১
৩.৭.৫।	সাবরাং ইকো টুরিজ্যম	৪১
৩.৭.৬।	টেকনাফ অভয়ারন্য	৪২
৩.৭.৭।	গর্জণ বন	৪৪
৩.৭.৮	নাফ নদীর মোহনা	৪৫
৩.৭.৯	জ্বালীয়ার দ্বীপঃ	৪৫
৪.০	**অধ্যায় ০৪: কক্সবাজার এ পর্যটন সমস্যা সমূহঃ**	৪৭
৫.০	**অধ্যায় -৫: Key Informant Interview এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ**	৫০
	অধ্যায়-৬: সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ মালা	৬১
৬.১	Key Informant Interview হতে প্রাপ্ত সুপারিশ	৬১
৬.২	জাতীয় পর্যটন নীতি মালা অনুযায়ী কক্সবাজারে পর্যটন বিকাশে সুপারিশ মালা	৬১
৬.৩	উপসংহার	৬৩
৭.০	তথ্যসূত্র	৬৪
	মানচিত্রের তালিকা	
ম্যাপ-১	ম্যাপ-১: বাংলাদেশের মানচিত্রে কক্সবাজার জেলা	০১
	ছবিঃ	
ছবি-১	সুগন্ধা সমূদ্র সৈকত, কক্সবাজার	০৭
ছবি-২	লাবনী সৈকত, কক্সবাজার	০৭
ছবি-৩	ময়লা আবর্জ্যনা, সুগন্ধা বীচ, কক্সবাজার	০৮
ছবি-৪	লাইফ গার্ড, সুগন্ধা বীচ	০৮
ছবি-৫	সমূদ্র সৈকত ভাঙন শৈবাল পয়েন্ট	০৮
ছবি-৬	সমূদ্র সৈকত ভাঙন ভাঙন কবিতা চত্বর	০৮
ছবি ৭	বেওয়ারিশ কুকুর, কলাতলী বীচ	০৯
ছবি ৮	ভ্রাম্যমান হকার, কলাতলী বীচ	০৯
ছবি ৯-১০:	অথ মেধা ক্যাং, কক্সবাজার পৌরসভা	০৯
ছবি-১১:	বার্মিজ মার্কেট, কক্সবাজার	১০
ছবি-১২-১৩	ঝিনুক মার্কেট, লাবনী বীচ, কক্সবাজার	১০
ছবি-১৪	রাডার স্টেশন, কক্সবাজার	১১
ছবি-১৫-১৬	হিলটপ সার্কিট হাউজ ও প্যাগোডা	১২
ছবি-১৭-১৮	ছাচি চৌধুরী মসজিদ, কক্সবাজার	১৩
ছবি-১৯	মেরিন ড্রাইভ, দরিয়ানগর, কক্সবাজার	১৪
ছবি-২০-২১	নাজিরার টেক শুটকি পল্লী, সমিতি পাড়া, কক্সবাজার	১৪
ছবি-২২	দরিয়ানগর গুহা	১৫
ছবি-২৩	দরিয়ানগর প্যারাসাইলিং	১৫
ছবি-২৪	দরিয়ানগর পার্ক	১৫
ছবি-২৫	ভংগুর ঝুলন্ত ব্রীজ, দরিয়ানগর পার্ক	১৬

ছবি-২৬	ঝুকিপূর্ন বাশের রেলিং, দরিয়ানগর পার্ক	১৬
ছবি ২৭-২৮	মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	১৬
ছবি ২৯	লবনের খামার, ইসলামপুর, কক্সবাজার	১৭
ছবি-৩০	গোল দিঘী, কক্সবাজার পৌরসভা	১৭
ছবি ৩১-৩২	রেডিয়্যান্ট ফিশ একুরিয়াম, কক্সবাজার পৌরসভা	১৮
ছবি-৩৩-৩৪	হিমছড়ি পাহাড় ও ঝর্ণা, রামু, কক্সবাজার	১৮
ছবি ৩৫	হিমছড়ি পাহাড়ে, ঝুকিপূর্ণ বাশের রেলিং	১৯
ছবি ৩৬	রাবার বাগান, রামু, কক্সবাজার	২০
ছবি ৩৭	ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের বাড়ী, রামু, কক্সবাজার	২০
ছবি ৩৮-৩৯	রাজারকুল বোটানিক্রাল গার্ডেন, রামু, কক্সবাজার	২১
ছবি ৪০	রামকুট তীর্থধাম, রামু, কক্সবাজার	২২
ছবি ৪১	রাংকুট বৌদ্ধ মন্দির, রামু, কক্সবাজার	২৩
ছবি-৪২	ভূবনশান্তি ১০০ ফুট সিংহ শয্যা গৌতম বুদ্ধ মূর্তি	২৫
ছবি-৪৩	কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার, রামু	২৫
ছবি-৪৪	কানা রাজার সুড়ংগ, রামু, কক্সবাজার	২৭
ছবি-৪৫-৪৬	ডুলাহাজরা সাফারী পার্ক,চকোরিয়া, কক্সবাজার	২৮
ছবি-৪৭	বীর কমলার দিঘী, কক্সবাজার	২৮
ছবি-৪৮	মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান,চকোরিয়া, কক্সবাজার	২৯
ছবি-৪৯	ফাসিয়াখালী জাতীয় উদ্যান, চকোরিয়া, কক্সবাজার	৩০
ছবি-৫০-৫১	আদিনাথ মন্দির ও প্যাগোডা, মহেশখালী, কক্সবাজার	৩১
ছবি-৫২	সোনাদীয়া দ্বীপ, মহেশখালী, কক্সবাজার	৩২
ছবি-৫৩-৫৪	বড় রাখাইন পাড়া বৌদ্ধ মন্দির, মহেশখালী, কক্সবাজার	৩৩
ছবি-৫৫	আদীনাথ মন্দির জেটি ঘাট, মহেশখালী, কক্সবাজার	৩৪
ছবি-৫৬-৫৭	ইনানী পাথুরে বীচ উখিয়া, কক্সবাজার	৩৫
ছবি-৫৮	পাটুয়ারটেক পাথুরে বীচ, উখিয়া, কক্সবাজার	৩৫
ছবি-৫৯	কুতুবদিয়া বাতিঘর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	৩৬
ছবি-৬০	বায়ু বিদ্যুত, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	৩৭
ছবি-৬১-৬২	সমূদ্রসৈকত, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	৩৮
ছবি-৬৩	মাথিনের কুপ, টেকনাফ, কক্সবাজার	৪০
ছবি-৬৪	শাহপরীর দ্বীপ , টেকনাফ, কক্সবাজার	৪০
ছবি-৬৫-৬৬	টেকনাফ ট্রানজিট পয়েন্ট জেটিঘাট, টেকনাফ, কক্সবাজার	৪১
ছবি-৬৭	কুদুম গুহা, টেকনাফ, কক্সবাজার	৪৩
ছবি-৬৮	গর্জণ বন, জাহাজপুরা, টেকনাফ, কক্সবাজার	৪৪
ছবি-৬৯	নাফ নদীর মোহনা, টেকনাফ, কক্সবাজার	৪৫
ছবি-৭০-৭১	জালীয়ার, টেকনাফ, কক্সবাজার	৪৫
ছবি-৭২	হোটেল ভাড়া	৪৯
ছবি-৭৩	Key Informant Interview, লং বীচ হোটেল, কক্সবাজার	৫০
ছবি-৭৪	Key Informant Interview(টুরিস্ট), হোটেল কল্লোল, কক্সবাজার	৫৩
ছবি-৭৫	Key Informant Interview (রবি এক্সপ্রেস, পরিবহন অফিস), কক্সবাজার	৫৫
ছবি-৭৬	Key Informant Interview,অতিঃজেলা মাজিট্রেট, কক্সবাজার	৫৮
ছবি-৭৭	Key Informant Interview,সহকারী পুলিশ সুপার, টুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার	৫৮

অধ্যায়-১: ভূমিকা

১.১ পটভূমিঃ

পর্যটন শিল্প বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ শিল্প। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাছাড়া পর্যটন শিল্পের কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব দুর হচ্ছে। কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন হচ্ছে। বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৈরি হচ্ছে।বিশ্ব অর্থনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, বেসরকারি বিনিয়োগকারীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। পর্যটন শিল্প আমাদের বেকারত্ব দূরীকরণসহ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনা- সমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। দিগন্তজোড়া সবুজের সমারোহ, শ্যামল- শোভন বন-বনানী, উঁচু-নিচু পাহাড়, সুকণ্ঠি পাখির কলকাকলি, দেশ জোড়া রুপালি নদীর বিস্তার, ঋতুতে ঋতুতে রঙ আর রুপের অপরুপ বর্ণিল শোভা সবকিছু মিলে এদেশ সৌন্দর্য মহিমায় অনন্য। দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের পর্যটন সুবিধা দিতে সরকার তাই এদেশে গড়ে তুলেছে পর্যটন শিল্প।এ শিল্প এখনো নানা কারণে তেমন বিকশিত না হলেও এর সম্ভাবনা প্রচুর, উন্নয়নও অপরিহার্য।

বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের বাংলাদেশের কক্সবাজারে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার এছাড়াও এখানে আছে সাগর, নদী, বন, পাহাড়, দ্বীপ ইত্যাদি। যোগাযোগের জন্য এখানে আছে সমুদ্রবন্দর, বিমান বন্দর রেল স্টেশন ও সড়ক যোগাযোগ। এ সব দিক বিবেচনায় কক্সবাজার বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থান।

১.২ অবস্থান ও আয়তনঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ২০ডিগ্রি ৩৫মিঃ থেকে ২১ডিগ্রি ৫৬মিঃ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১ডিগ্রি ৫০মিঃ থেকে ৯২ডিগ্রি ২৩মিঃ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে কক্সবাজার জেলার অবস্থান। রাজধানী ঢাকা থেকে এ জেলার দূরত্ব প্রায় ৪০২ কিলোমিটার এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদর থেকে প্রায় ১৪৩ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা; পূর্বে বান্দরবান জেলা, নাফ নদী ও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। কক্সবাজার জেলার আয়তন ২৪৯১.৮৬ বর্গ কিঃ মিঃ।

১.৩ যৌক্তিকতাঃ

পৃথিবীকে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজ বলছি। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সব দেশ মিলেমিশে একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সময় এসেছে পরস্পরের কাছে পরস্পরকে মেলে ধরার। নিজের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ভ্রমণপিপাসু বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের এখনই সময়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও পর্যটন শিল্প যথাযথ উন্নতি ও তদারকির মাধ্যমে লাভজনক শিল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের বৈদেশিক আয়ের একটা বিশেষ উৎস পর্যটন শিল্প। বিশ্বায়নের যুগে পর্যটন একটা লাভজনক অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির মাধ্যম। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও পর্যটন শিল্পের যথাযথ উন্নতি ও তদারকিতে লাভজনক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। পেট্রো ডলারের মত চিংড়ি ও পোশাক রপ্তানি, চা, চামড়া, পাট যা দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামামো ধরে রাখতে এককালে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল সে তুলনায় বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে তাদের ব্যায়িত বিদেশি কারেন্সি অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

পর্যটন আজকের বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং অতিদ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের বাংলাদেশের কক্সবাজারে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার এছাড়াও এখানে আছে সাগর, নদী, বন, পাহাড়, দ্বীপ ইত্যাদি। যোগাযোগের জন্য এখানে আছে সমুদ্রবন্দর, বিমান বন্দর রেল স্টেশন ও সড়ক যোগাযোগ। এ সব দিক বিবেচনায় কক্সবাজার বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থান।। এখানে বিভিন্ন সমস্যাও বিদ্যমান রয়েছে যার ফলে কাংক্ষিত পর্যটন শিল্প এখানে গড়ে উঠছে না। এ জন্য কক্সবাজার এর পর্যটন সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এ গবেষণার কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

১.৪ গবেষণা এলাকা

কক্সবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি পর্যটন শহর। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত। কক্সবাজার চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫২ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব ৪১৪ কি.মি.। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে পর্যটন কেন্দ্র। দেশের রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে এবং বাসযোগে কক্সবাজার যাওয়া যায়। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার অ রেললাইন স্থাপনের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।কক্সবাজার জেলা তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত যা কক্সবাজার শহর থেকে বদরমোকাম পর্যন্ত একটানা ১২০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এখ রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর, সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশান, সাগর, নদী, দ্বীপ ইত্যাদি।কক্সবাজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং অন্যতম সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থান।এ জন্য গবেষনার জন্য কক্সবাজার কে নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণা উদ্দেশ্য

১. কক্সবাজার এর পর্যটন স্থান গুলির তালিকা তৈরী করা
২. পর্যটন বিকাশে অন্যতম বাধা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা
৩. পর্যটন বিকাশে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরী করা

১.৬ সীমাবদ্ধতা

মাঠ পর্যায়ে জরিপের কাজ অনেক কম সময়ের মধ্যে করা হয়েছে। অফিসে প্রয়োজনীয় জনবল কম ছিল। যথাসময়ে গবে অনুমোদন পাওয়া যায়নি এবং গবেষণার বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ার কারনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হ

অধ্যায়-০২: কক্সবাজার এর বর্তমান চিত্র

২.০ কক্সবাজার

কক্সবাজার শহরকে বলা হয় পর্যটন নগরী। এই অভিধাটি যতটা আমাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে, ততটা বাস্তবে নেই। না থাকার কারণ, পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজার শহরকে যেভাবে গড়ে তোলা দরকার ছিল অতীতে সেভাবে গড়ে তোলার কোনো ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বাংলাদেশের জন্য কক্সবাজার প্রকৃতির এক অনন্য-সাধারণ উপহার। সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা কক্সবাজারের নয়নাভিরাম দৃশ্যের কোনো তুলনাই হয় না। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান এখানেই। সমুদ্র সৈকতের কোল ঘেঁষে কক্সবাজার শহরকে পর্যটন নগরী হিসেবে এবং গোটা কক্সবাজার এলাকাকে সম্ভাবনার আলোকে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা হয়ে উঠতে পারে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ লাইফ লাইন। পর্যটন সম্ভাবনা ছাড়াও শিল্প-অর্থনীতির ব্যাপক সম্ভাবনা কক্সবাজারে রয়েছে। এদিকে এতদিন সেভাবে নজর দেয়া না হলেও বর্তমান সরকারের আমলে কক্সবাজারের সার্বিক উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, যার বাস্তবায়ন এখন জোর কদমে চলছে। পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজার শহরকে সাজানোর সর্বমুখী প্রস্তুতি চলছে। একই সঙ্গে অন্যান্য এলাকার উন্নয়নেও নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্র সৈকতকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প থেকে অনেক দেশের অর্থনীতিতে বড় অংকের অর্থের যোগান আসে। কক্সবাজারের পর্যটন শিল্প থেকেও দেশের অর্থনীতিতে কিছু অর্থ আসে বটে, তবে তা সম্ভাবনার তুলনায় খুব বেশি নয়। কক্সবাজারের পর্যটন শিল্প থেকে অর্থের প্রবাহ বাড়াতে সৈকতের উন্নয়নসহ অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিকল্প নেই। বিশ্বে এমন অন্তত ১১টি দেশ রয়েছে বলে জানা যায় যাদের সমুদ্র সৈকত অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেই সব দেশের সমুদ্র সৈকত পর্যটন-বান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে।

সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন ও পর্যটন-বান্ধব সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো ছাড়াও ঘটিভাঙ্গা, সোনাদিয়া, কুতুবজোম খলকাটায় জেগে ওঠা প্রায় ১৬ হাজার একর এলাকার উন্নয়নে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার ৩০টিরও বেশি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এসব প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমনটাও মনে করা হচ্ছে, কক্সবাজারের পর্যটন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত থেকে বছরে যে অর্থ আসবে, তা গার্মেন্ট বা জনশক্তি রফতানি থেকে আসা অর্থের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যাবে। এখন সমুদ্র সৈকতকে ঘিরে যেসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তাতে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও বিনিয়োগ রয়েছে চীন, জাপানসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের। প্রকল্পগুলো শেষ হলে যোগাযোগ ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন এলাকায় পরিণত হবে। গৃহীত প্রকল্প বা যাদের কাজ শুরু হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে, মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পিডিবির তত্ত্বাবধানে হোয়ানোক-কালমারছড়ায় ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহেশখালীতে ৭টি ও টেকনাফে ৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দোহাজারী কক্সবাজার হয়ে মিয়ানমার সীমান্ত পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ হচ্ছে, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হচ্ছে, রামুতে হচ্ছে বিকেএসপি, পেকুয়ায় সাবমেরিন ঘাঁটি, ঠাকুরতলায় কোস্টগার্ডের স্টেশন। ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজ, সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ এবং রামুতে সেনাবাহিনীর দশম পদাতিক ডিভিশনের সেনানিবাস। কক্সবাজার শহরসহ গোটা কক্সবাজারে নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের যে বিশাল কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেবল কক্সবাজারের মানুষই নয়, সমগ্র দেশের মানুষই এতে উজ্জীবিত, উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত। কক্সবাজারের বিপুল সম্ভাবনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার বিনিয়োগ এবং সহযোগিতাকে আমরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। আমরা মনে করি, গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর সবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজার শহরের প্রতিষ্ঠাসহ সমগ্র কক্সবাজারের চেহারা পাল্টে যাবে। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই একটা নয়া দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে। দেশ ও দেশের মানুষ এর সুফল ভোগ করবে। আমরা উন্নয়নের এই রোড ম্যাপের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি[১]

আমাদের পর্যটন শিল্পে সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও সম্ভাবনা অনেক । সমস্যা সমূহ দূরীভূত হলে আমরা এ সম্ভাবনাময় শিল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারব । আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে যাবে একধাপ ।বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি। ধরা হচ্ছে ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এ বিপুলসংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে। এ ছাড়াও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্যমতে, ২০১৮ সালের মধ্যে এ শিল্প থেকে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ১০.৫ ভাগ। বাংলাদেশ যদি এ বিশাল বাজার ধরতে পারে তাহলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি। পর্যটন সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতার (টিটিসিআই) দিক থেকে ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৮। পর্যটনকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ প্রমাণ করেছে 'পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি। ' বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাব মতে, সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭৫ শতাংশই আসে পর্যটন খাত থেকে। তাইওয়ানের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৬৫ শতাংশ, হংকংয়ে ৫৫ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৫০ শতাংশ ও

থাইল্যান্ডে ৩০ শতাংশ। মালদ্বীপের অর্থনীতি প্রায় পুরোটাই পর্যটন খাতের ওপর নির্ভরশীল। ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোও মূল পর্যটননির্ভর। মালয়েশিয়ার বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৭ শতাংশই আসে পর্যটন খাত থেকে। এশিয়ার সুইজারল্যান্ড নামে খ্য ভুটানও পর্যটনে এখন অনেক এগিয়ে।পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল ১০ পর্যটন কেন্দ্রের একটি হিসেবে ভাবা হচ্ছে। এ শিল্পের যথাযথ সমৃদ্ধির জন্য যথাযথ সরকারি নীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় বাজে বাস্তবসম্মত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। পর্যটন শিল্পকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ বেকারত্ব বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপ সুযোগ এনে দিতে পারে এ শিল্প। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের (ডব্লিওটিটিসি) ২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০ সালে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পে ১২ লাখ ৮১ হাজার ৫০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা বাংলাদেশের সর্বমোট কর্মসংস্থা ১.৮ ভাগ। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ২৭ লাখ ১৪ হাজার ৫০০টি চাকরির সৃষ্টি হয়েছে, যা সর্বমে কর্মসংস্থানের ৩.৭ ভাগ। ডব্লিওটিটিসির মতে, এ বছরের শেষে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান দাঁড় ৩৮ লাখ ৯১ হাজার, যা বাংলাদেশের সর্বমোট কর্মসংস্থানের ৪.২ ভাগ। এর ফলে বাংলাদেশের এ শিল্পে বার্ষিক কর্মসংস্থানের প্রবৃ ২.৯ ভাগ। পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ অবদানের ভিত্তিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অবস্থান ১৪২ত কক্সবাজারের নৈসর্গিক সৌন্দর্য কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স,যা দেশের জাতীয় অর্থনীতি বড় ভূমিকা রাখতে পারে[২

"ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৫৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার অধীনে কক্সবাজার মহকুমায় উন্নীত হয়। সে দিক দিয়ে কক্সবাজার একটি প্রা মহকুমা। সে সময় কক্সবাজার মহকুমার আওতায় থানা ছিল চারটি। এই চারটি থানা হচ্ছে কক্সবাজার, টেকনাফ চকরিয়া মহেশখালি। পরববর্তী সময় কক্সবাজার থেকে রামু, টেকনাফ থান থেকে উখিয়া এবং মহেশখালি। পরবর্তী সময়ে কক্সবাজার থে রামু, টেকনাফ থানা তেকে উখিয়া এবং মহেশখালি থেকে কুতুবদিয়াকে পৃথক করে নতুন সৃষ্টি করা হয়। এর ৮টিতে। পাক-ভার উপ-মহাদেশের প্রাচীন মহকুমার ধারাবাহিকতায় ১৮৬৯ সালে কক্সবাজার শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলঅ হয় কক্সবাজ মিউনিসিপ্যালিটি। উক্ত টাউন কমিটি গঠন থেকে শুরু করে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন চট্টগ্র জেলার প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি। ১৯৭২ সালেই সরকার এ ব্যবস্থাকে রদ করে টাউন কমিটিতে নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়নের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অ্যাডভোকেট বিপিন বিহারি রক্ষিত কক্সবাজ পৌরসভার প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে তৎকালীন মহকুমা সদরের ২.৬২ বর্গমাইল এলা নিয়ে কক্সবাজার মিউনিসিপালিটি তথা পৌরসভা গঠিত ছিল। সর্বশেষ ২০০৮ সালে ৩২.৯০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে কক্সবাজ পৌর এলাকাকে সম্প্রসারিত করা হয়। পূর্বের পৌর এলাকায় ওয়ার্ড ছিল তিনটি। পরে উক্ত ৩টি ওয়ার্ডকে বিভক্ত করে ৯টি ওয় ভাগ করা হয়। বর্তমানে সম্প্রসারিত পৌরসভাকে ১২টি ওয়ার্ডে বিভাজন করা হয়েছে। আবার ১২টি ওয়ার্ডকে সংরক্ষিত নারী আসনে জন্য ৪ টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে [৩]।

২.১ কক্সবাজার এর পর্যটন সম্ভবনাঃ

পর্যটননগরী কক্সবাজারকে আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা ইতিমধ্যেই বাস্তবা হওয়া শুরু হয়েছে। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে কক্সবাজারে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত হয়ে অসংখ্য হোটেল কটেজ, মোটেল, পাঁচতারা হোটেল, খাবার হোটেল রয়েছে। এখানে রয়েছে ঝিনুক মার্কেট। বার্মা, থাইল্যান্ড, চি থেকে আনা পণ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে বার্মিজ মার্কেট। এখানে রয়েছে দেশের একমাত্র পিস একুরিয়াম। আরো রয়েছে প্যারাসেলি ওয়াটার বাইকিং, বিচ বাইকিং, কক্সকার্নিভাল সার্কাস শো, দরিয়া নগর ইকোপার্ক, কক্সবাজার, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নি অসংখ্য স্থাপত্য, ফিউচার পার্ক, শিশুপার্ক এবং অসংখ্য ফটোসুট স্পট, এখানে আরো আছে টেকনাফ জিওলজিক্যাল পার্ক। এখ উপভোগ করার জন্য রয়েছে নাইট বিচ কনসার্ট। সমুদ্রসৈকতকে লাইটিং করার মাধ্যমে এখানে রাতের বেলায় সমুদ্র উপভোগ ক সুযোগ করা হয়েছে। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এখানে নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সি-একুরিয়াম। ক্যাবল কার এ ডিজনী ল্যান্ড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কক্সবাজার সড়ক পথে এবং আকাশ পথে যাতায়াত করা যায়। রাজধানী ঢাকা থেকে সড় পথে বাস, কার মাইক্রোবাসে সরাসরি যাতায়াত করা যায়। কক্সবাজারে রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ঢাকা থেকে সরাস ফ্লাইটে কক্সবাজার যাওয়া যায়। পর্যটনের অপার সম্ভাবনা কক্সবাজারে বিদ্যমান থাকায় সরকার কক্সবাজারের উন্নয়নে বি

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকার কক্সবাজারের উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১২টিসহ ৬৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রায় ১৩ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। দু-একটি ছাড়া বেশির ভাগ প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ সড়কের উদ্বোধন করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিণত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কক্সবাজারের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা দ্রুত এবং আরামদায়ক করার লক্ষ্যে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল পথ নির্মাণ করা হচ্ছে। রেল পথের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রেল যোগাযোগ চালু হওয়ার কথা। এখানে উন্নত মানের রেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রেল যোগাযোগ চালু হলে কক্সবাজারে পর্যটকদের সংখ্যা দশগুণ বেড়ে যাবে। কারণ রেল ভ্রমণ আরামদায়ক নিরাপদ হওয়ার কারণে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা কক্সবাজার আসতে আগ্রহবোধ করবেন। দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত দীর্ঘ ১২৮ কিলোমিটার পথ সবুজ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাবে। কক্সবাজার পর্যন্ত রেলযোগাযোগ চালু হলে কক্সবাজারের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে যাবে[৩]।

অধ্যায়-০৩. কক্সবাজারের পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থান সমূহের তালিকা ও সমস্যাঃ

৩.১। কক্সবাজার সদরঃ

১৭৮৪ সালে আভা রাজা আরাকান দখল করে নেওয়ার পরে কক্সবাজারে শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। বর্ত কক্সবাজারের রামু ছিল এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮০০ সালের পরেই মূলত কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থ প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮৫৪ সালেই কক্সবাজারকে মহকুমা হিসেবে উন্নীত করা ঞয়। অবশ্য এর আগেই কক্সবাজার শহরের বর্ত কাচারি পাহাড়ে একটি প্রাচীন দালান ছিল। উক্ত দালানের নির্মাণ কাঠামো ছিল বর্তমান চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদাল পুরোনো ভবনের আদলে। গবেষখদের অভিমত, কক্সবাজারের উক্ত দালানটি ছিল পতুর্গিজদের নির্মিত। বর্তমান জেলা প্রশাস কার্যালয়ের রেকর্ড রুমের উত্তর পাশেই ছিল সেই দালানটি। বঙ্গোপসাগরের তীরে নির্মিত উক্ত দালান থেকেই পতুর্গিজ জলদস্যু সমুদ্রগামী জাহাজে লুটপাট চালাতো। উক্ত দালানের মেঝ থেকে ছাদ প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ফুট উঁচুতে। দালানের দরজা ছিল প্রায় থেকে দশ ফুট। ১৯৮৮ সালের দিকে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ভবন নির্মাণের সময় সেই ঐতিহাসিক ও মূল্যবা স্থাপত্য শৈলী বি পতুর্গিজ দালানটি ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমানে প্রাচীন যেসব দালান আছে তার বয়স একশত বছরের অধিক নয়। তবে দু'এ দালানের নির্মাণকাঠামো মোগল আমলের দালানের আদলে নির্মিত। তার অর্থ নির্মাণশৈলীকে ব্যবহার করে প্রাচীনত্ব দেওয়ার ে করা হয়েছে। উল্লেখ করা ওডতে পারে যে, কক্সবাজারে মোগল নির্মাণনকশাকে ধারণ করে নির্মিত কয়েকটি মসজিদ রয়ে মসজিদগুলো হচ্ছে কক্সবাজার শহরের বিজিবি সেক্টর হেডকোয়ার্টারের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত পোটকা মসজিদ, রামু উজে জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের আশকরকাটা বা অষ্টকাটা মসজিদ ও চকরিয়া উপজেলার মানিকপুর-সুরাজপুর আকেটি মসজিদ কক্সবাজার সদর উপজেলার পাতলি মাছুয়াখালি (পিএমখালি) ইউনিয়নের জুমছরি মসজিদ। কিন্তু এলাকাবাসী কিছুদিন পূর্বে পে ডলারের আগমনে উক্ত মসজিদটি ভেঙে দেশে প্রচলিত নকশার মসজিদ নির্মাণ করেছে। অপরদিকে এলাকার কিছু উৎস লোকজনের আগ্রহে এবং আয়তনে ছোট এ অজুহাতে মসজিদটি ভেঙে নুতন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এলাকাবাসী মসজিদ ইতিহাস ও প্রাচীনত্বকে গুরুত্ব দিলো না। বর্তমানে প্রাচীনকালের স্থাপত্য শৈলি নিয়ে একমাত্র ছাদি চৌধুরীর মসজিদটি কালের স হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাচীন এসব স্থাপত্য পর্যটক ছাড়াও গবেষখদেরকে আকর্ষণ করে। কক্সবাজারের প্রাচীনত্ব এবং স্থাপত্যশিল্পের অনন্য বৈশিষ্টম স্থাপনাসমূহের মধ্যে কক্সবাজার শহরের ঝিলংজা ইউনিয়নের মোগল স্থাপত্য বিশিষ্ট মসজিদ ছাদি চৌধুরীর মসজিদ, চক উপজেলার ফজল কিউকের মসজিদ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অগ্নমেধা ক্যাং, হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্রতম স্থান মহেশ উপজেলার আদিনাথ মন্দির, রামু উপজেলার রাংকোট ও লামারপাড়া ক্যাং, জাদি বা জেদি বা স্মৃতিস্তম্ভ। এসব প্রতিষ্ঠানের বি নিম্নে প্রদান করা হল।

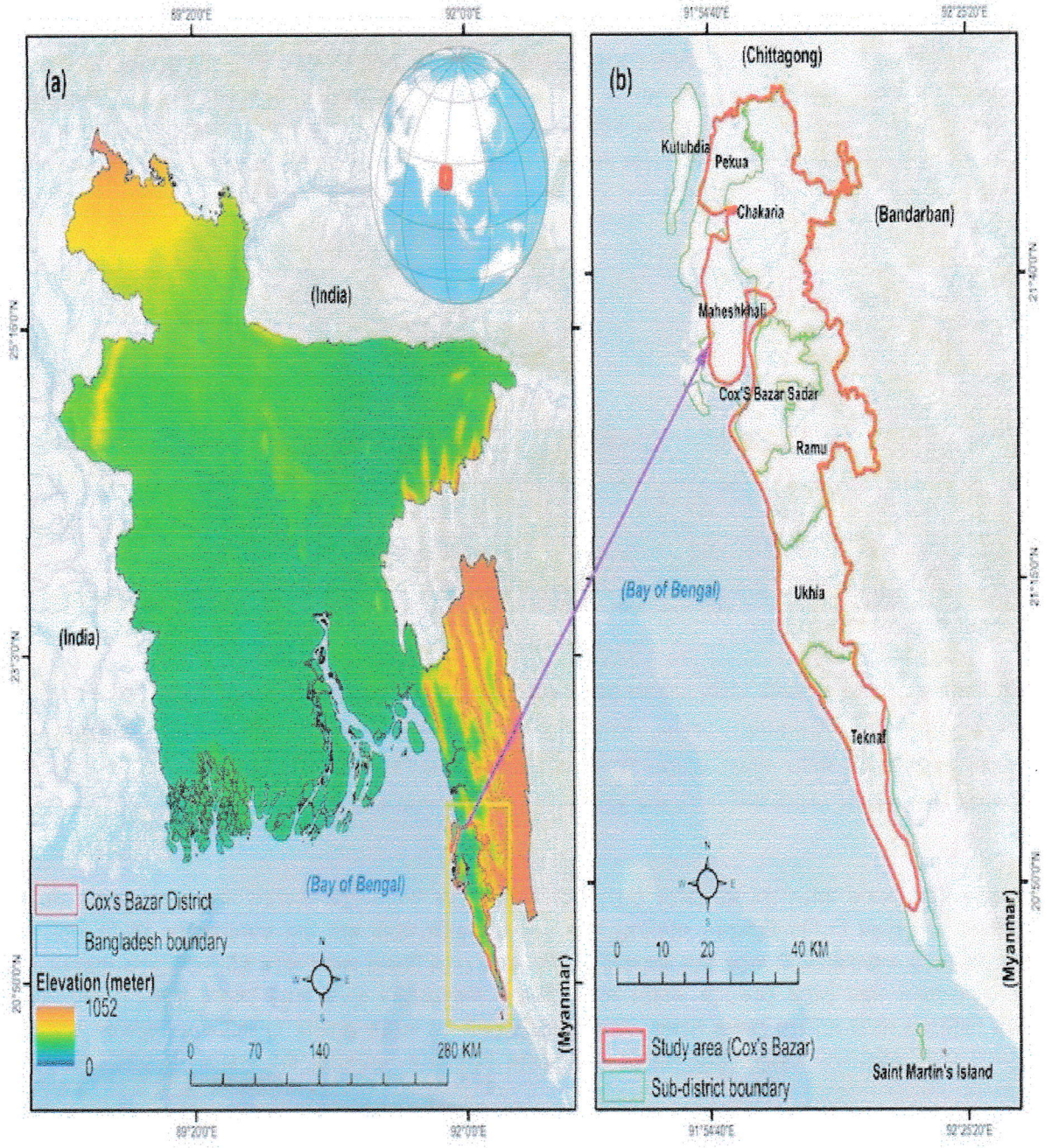

ম্যাপ-১: বাংলাদেশের মানচিত্রে কক্সবাজার জেলা

৩.১.১। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি পৃথিবীর দীর্ঘতম অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত। ১২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সমুদ্র সৈকতের বৈশিষ্ট্য হলো পুরে সমুদ্র সৈকতটি বালুকাময়, কাদার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।**সুগন্ধা বীচ** বালিয়াড়ি সৈকত সংলগ্ন শামুক-ঝিনুকসহ নানা প্রজাতির প্রবা সমৃদ্ধ বিপণি বিতান, অত্যাধুনিক হোটেল-মোটেল-কটেজ, নিত্য নবসাজে সজ্জিত বার্মিজ মার্কেট সমূহে পর্যটকদের বিচর কক্সবাজার শহরে পর্যটন মৌসুমে প্রাণচাঞ্চল্য থাকে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত একটি মায়াবী ও রূপময়ী সমুদ্র সৈকত। প্রতিদি প্রতিক্ষণ এর রূপ পরিবর্তন করে। শীত-বর্ষা-বসন্ত-গ্রীষ্ম এমন কোনো ঋতু নেই যখন সমুদ্র সৈকতের চেহারা বদলায় না। প্রত্যুষে এ রকম তো মধ্যাহ্নে এর রূপ অন্য রকম।

ছবি-১: সুগন্ধা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার

ছবি-২:লাবনী সৈকত, কক্সবাজার

কলাতলী বিচ কক্সবাজারের আরেকটি পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র। এটা কক্সবাজারের মধ্যে অবস্থিত। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানুষ এখা ভ্রমণ করতে আসেন, সমুদ্রে গোসল করতে আসেন, আসেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কলাতলী বিচে নানা ধরনের খাবা রেস্টুরেন্টসহ আরো অনেক পর্যটন সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে চাঁদনি রাতে বিচে হাঁটা সত্যিই রোমঞ্চকর সকল বয়সী মানু জন্যই। সকাল এবং সন্ধ্যাতে এখানে উপভোগের জন্য রয়েছে নানা ধরনের শুকনো মাছ, খাবার ইত্যাদি।

লাবনী বিচ

বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত বললে প্রথমেই চোখে ভেসে ওঠে কক্সবাজারের কলাতলীতে অবস্থিত কক্সবাজার পুরাতন সি-বিচ লাবণী পয়েন্ট বা পুরাতন সি-বিচ হিসেবেও পরিচিত। সমুদ্র দেখতে বাঙালি মাত্রই ছুটে যান কক্সবাজারের এই সি-বিচে। দে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কক্সবাজারগামী বাসে করে কলাতলী সি-বিচ রোডে নেমে রিকশা অথবা পায়ে হাঁটা পথে যেতে পারবেন এই দুটোতে। কক্সবাজার শহর থেকে নৈকট্যের কারণে লাবণী বিচকে কক্সবাজারের প্রধান সমুদ্র সৈকত বলে বিবেচনা করা হ নানারকম জিনিসের পসরা সাজিয়ে সৈকত সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ছোট বড় অনেক দোকান যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এছা এখানে পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে ঝিনুক মার্কেট। সীমান্তপথে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে আসা বাহ জিনিসপত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে এই মার্কেট[৪]

সমস্যাসমূহঃ

ক) সমুদ্র সৈকতের সঠিক ব্যবহারের ব্যর্থতাঃ

১২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সমুদ্র সৈকতের শুধুমাত্র ১০% এরও কম সঠিকভাবে পর্যটনের কাজে ব্যবহার হয়না। শুধুমাত্র লাবনী পয়েন্ট হতে কলাতলী পয়েন্ট পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা টুরিস্ট রা ব্যবহার করতে পারে। অন্য স্থান গুলি দিনের বেলা নামা গেলেও অন্যান্য সুবিধা বিদ্যমান নাই।

খ) সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবঃ

১২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সমুদ্র সৈকতের লাবনী থেকে কলাতলী, ইনানী পয়েন্ট এ সারা বছর দিনের বেলায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলে কিন্তু সন্ধ্যার পরে কোন কার্য্যক্রম নাই

ছবি-৩: ময়লা আবর্জ্যনা, সুগন্ধা বীচ, কক্সবাজার

গ) নিরাপত্তার সমস্যাঃ

শুধুমাত্র লাবনী পয়েন্ট হতে কলাতলী পয়েন্ট পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা, হিমছড়ি ইনানী পয়েন্টে দিনের বেলায় ইনানী পয়েন্ট টুরিস্ট পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। অন্য কোথাও নাই।

ঘ) লাইফ গার্ডঃ ১২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সমুদ্র সৈকতের শুধু মাত্র ০৩ টি পয়েন্ট এ লাইফ গার্ড বিদ্যমান আছে কিন্তু পর্যাপ্ত নাই। ফলে প্রায় টুরিস্ট গোসল করতে নেমে জোয়ারে নিখোজ হয় এবং মৃত্যু মুখ পতিত হয়।

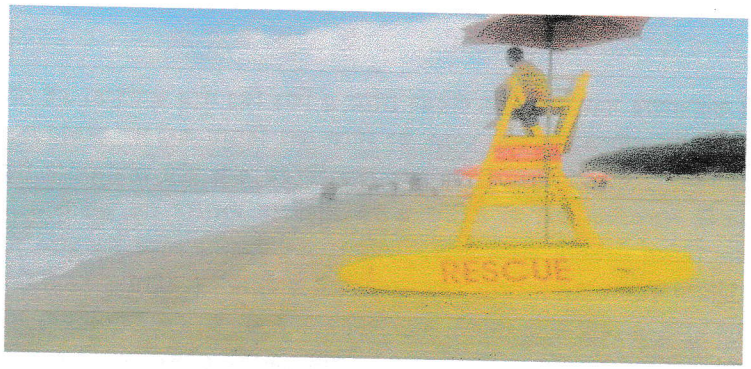

ছবি-৪: লাইফ গার্ড, সুগন্ধা বীচ

ঙ) সমূদ্র সৈকত ভাঙনঃ

ছবি-৫,৬: সমূদ্র সৈকত ভাঙন শৈবাল পয়েন্ট ও কবিতা চত্বর

প্রতি বছর জোয়ারে সৈকত ও ঝাউবন বিলীন হচ্ছে কিন্তু স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নাই।

চ)। সমূদ্র সৈকতে পর্য্যটক হয়রানীঃ

সৈকতে বেড়াতে আসলে পর্য্যটকেরা হিজড়া, হকার,ভিক্ষুক, ক্যামরাম্যান, কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়।

ছ) অসংখ্য বেওয়ারিশ কুকুর চলাচল

ছবি-৭: বেওয়ারিশ কুকুর, কলাতলী বীচ

ছবি-৮: ভ্রাম্যমান হকার, কলাতলী বীচ

৩.১.২। অগ্ন মেধা ক্যাং(কক্সবাজার পৌরসভা)

মাহাসিংদোগ্রী বৌদ্ধ মন্দির কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ থেকে ৫ কিঃ মিঃ দুরে অবস্থিত। এই বৌদ্ধমন্দির কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কম্পপ্লেক্স এর পাশে রাখাইন পল্লীতে অবস্থিত। ১৭৯৯ ইং সালে লেঃ হিরেম কক্স দশ হাজার (১০,০০০) আরাকানী শরণণার্থী পুনর্বাসনের জন্য "অংখোঁছা" গ্রামটি পুনঃ নির্মাণ করেন এবং লেঃ হিরেম কক্স তাঁর নামানুসারে উক্ত গ্রামটির নামকরণ করেন "কক্সবাজার"। সকল আরাকানী শরণার্থীরা বর্মী বা বার্মিজ কর্তৃক আরাকান দখলের পর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে শুরু করলে আশ্রয়ে সন্ধানে অংখোঁছা সহ বিভিন্ন জায়গায় বসতি গড়ে তুলেছিল। এলাকাবাসীর সাথে উক্তস্থানে সম্মিলিতভাবে একটি বুদ্ধমুর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন এবং স্থানীয় ধর্মপ্রাণ উপাসকদের সহায়তায় একটি স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মানের কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে কক্স সাহেব মারা গেলে বাকী অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী বছর স্থানীয় বাসিন্দাবৃন্দ (রাখাইন বৌদ্ধরা) সমাপ্ত করেন। তখন সেই বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় "মাহাসিংদোগ্রী" স্থানীয় ধর্মপ্রাণ রাখাইন বৌদ্ধরা একটি বুদ্ধমুর্তি সেখানে স্থাপন করে। এই বুদ্ধমুর্তিটি মিঃ কক্স সাহেবের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আরাকান থেকে এখানে আনা হয়। এর নাম "কাথেট আসান" এখনও পর্যন্ত অতি পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। প্রতিবছর হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা এ বুদ্ধের পবিত্র মুর্তিকে পূজা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।(৫)

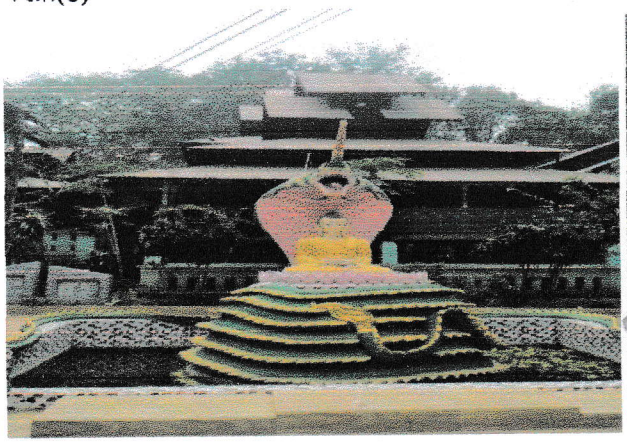

ছবি ৯-১০: অগ্ন মেধা ক্যাং, কক্সবাজার পৌরসভা

সমস্যাসমূহঃ

ক) টুরিস্ট স্পট হিসেবে কোন প্রচারনা নাই।
খ) সন্ধ্যার পরে এখানে ঘোরার কোন সুযোগ নাই।
গ)। গাড়ী পার্কিং কোন সুবিধা নাই
ঘ) মন্দিরের সম্মুখভাগে উম্মুক্ত ড্রেন বিদ্যমান
ঙ) মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভাব

৩.১.৩। বার্মিজ মার্কেট:

রাখাইন রমনীদের পরিচালিত বিভিন্ন রকম হস্তশিল্প ও মনোহরী দ্রব্যাদির দোকান। এ সব দোকান /মার্কেটের অবস্থান বেশীর ভাগই পূর্ব বাজারঘাটার দিকে।কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ হতে ৪ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। ১৯৬২ সালে এক রাখাইন উদ্যোগী মহিলা উনাং, টেকপাড়াস্থ বার্মিজ প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন তার নিজ বাড়ীতে খুবই ছোট পরিসরে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রাখাইন হস্তশিল্পের কিছু মালামাল-চাদর, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, চুরুট, পুরুষদের লুঙ্গি আর টুকিটাকি জিনিস পত্রের পসরা সাজিয়েছিল।কক্সবাজার বেড়াতে আসা দেশী বিদেশী পর্যটকরা এখানে ভিড় করতো। সেখান থেকেই আজকের এই সর্বজন স্বীকৃত বার্মিজ স্টোরের সুচনা।

পর্যটকদের চাহিদা অনুধাবন করে তিনি "কক্সবাজার কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ" নামে বাণিজ্যিকভাবে একটি স্টোর খোলেন নিজ বাড়ীর সামনে, তারপর একে একে গড়ে উঠে টিন টিন বার্মিজ স্টোর, রাখাইন স্টোর, উমে স্টোর, নূরানী এম্পোরিয়াম, বিবি ফ্যাশন ডায়মন্ড স্টোর প্রভৃতি। যা বার্মিজ স্টোর হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। যদিও শুরুতে স্টোরগুলোতে বার্মিজ কোন পণ্য ছিল না। পরবর্তীতে বার্মিজ পণ্য যেমন- লুঙ্গি, থামি, সেন্ডেল, আচার, বাম জাতীয় ভেসজ, স্নেখা- এক প্রকার প্রসাধন, বিভিন্ন জাতের পাথর এবং বার্মিজ হস্তশিল্পের- কাঠের ও ঝিনুকের তৈরী বিভিন্ন সৌখিন জিনিস সংযোজন হতে থাকে এবং "বার্মিজ স্টোর" নামের পরিপূর্ণতা লাভ করে।

খুবই স্বভাবিক অর্থেই বার্মিজ স্টোর বলতে বার্মিজদের দোকান এবং বার্মিজ পণ্য সামগ্রীর দোকান হিসেবে সবাই ধারণা করে থাকে। স্টোরগুলোতে বার্মিজ পণ্য সামগ্রী ঠিকই থাকে তবে দোকানীরা বার্মিজ নয়। এরা আরকানিজ বংশোদ্ভুত রাখাইন জাতি গোষ্ঠী। জাতিগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে রাখাইনদের সাথে বার্মিজের প্রচুর মিল রয়েছে বৈকি। তবে ভাষাগত ভিন্নতা রয়েছে। যেখানে সীমিত সংখ্যক রাখাইন মহিলা উদ্দ্যোক্তা যে ভাবধারায় বার্মিজ স্টোরের সুচনা করেছিল, যুগের বিবর্তনে আজ শত শত বার্মিজ স্টোর হয়েছে, স্টোরগুলোতে রাখাইন বা বার্মিজ পণ্যের প্রাচুর্যতা নেই বললেই চলে। রাখাইনদের পাশাপাশি অনেক মুসলিম-হিন্দু ব্যবাসায়ী শপিং মল নির্মান করেই তা বার্মিজ স্টোর বা বার্মিজ মার্কেট বলেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদের সংখ্যাই এখন সবচেয়ে বেশী। কিছু রাখাইন ব্যবসায়ী এখনো হাতে গোনা কিছু বার্মিজ স্টোর পরিচালনা করে চলেছে। স্রেফ জীবিকার তাগিদে যার মধ্যে মূল ধারার বার্মিজ স্টোরের রূপ খুঁজে পাওয়া সত্যিই দূরূহ।[৫]

ছবি-১১: বার্মিজ মার্কেট, কক্সবাজার

সমস্যাঃ

ক) বার্মিজ পণ্য সামগ্রীর দোকান হিসেবে সবাই জানলেও মূলত স্থানীয় সামগ্রী বিক্রয় হয়
খ) টমটম/রিক্সা/সিএনজি/রিক্সা ড্রাইভার কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়।
গ) স্থানীয় ঐতিহ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা নাই

৩.১.৪। ঝিনুক মার্কেট:

ঝিনুক শিল্পের রকমারি জিনিসপত্রের প্রধান বিক্রয় ও বিপনন কেন্দ্র। এর অবস্থান প্রধান সড়কে হোটেল হলিডের মোড়ের পশ্চিমে। ঝিনুক শিল্পের যাবতীয় কারুকার্য খন্ডিত জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায়। সমুদ্র সৈকতেও শামুক ঝিনুকের আরো অনেক বিক্রয় ও বিপনন কেন্দ্র রয়েছে।

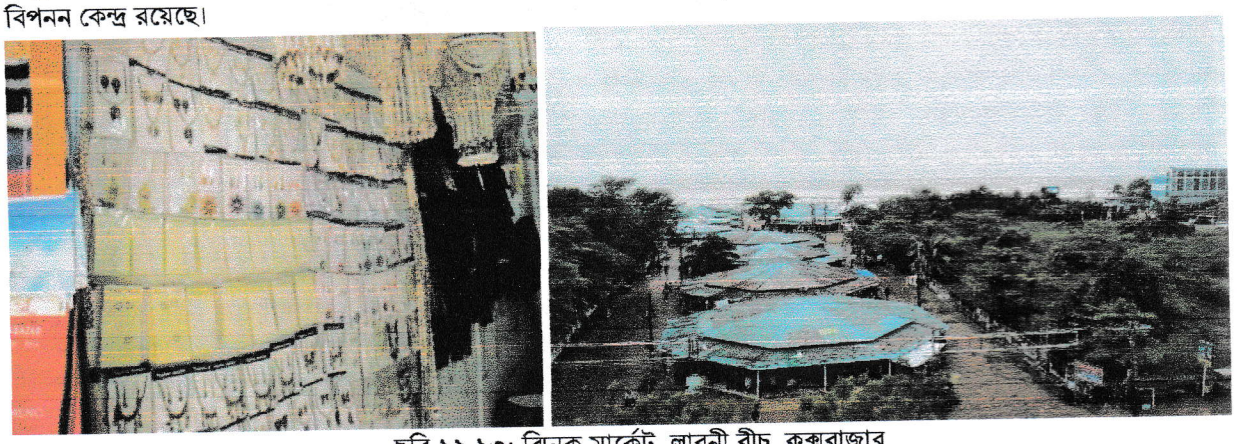

ছবি-১২-১৩: ঝিনুক মার্কেট, লাবনী বীচ, কক্সবাজার

সমস্যাঃ

ক) শিল্পের বিকাশে স্থানীয় কোন উদ্যোগ নাই
খ) মূল্য তালিকা নির্ধারিত নয়

৩.১.৫। রাডার স্টেশন

১৯৬৯ সালে সুইডিশ শিশুকল্যাণ সংস্থা ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় কক্সবাজার রাডার স্টেশনটি স্থাপন করা হয়। ২২ এপ্রিল, ২০০৭ সালে জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় রাডার সিস্টেমের উন্নয়ন সাধন করে উদ্বোধন করা হয়। রাডার স্টেশনটি হিলটপ সার্কিট হাউজের পাশে অবস্থিত। ৪০০ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে এ রাডার স্টেশনটি কার্যকর। রাডার স্টেশন সংলগ্ন পাহাড়ের চূঁড়ায় স্থাপিত লাইট হাউসটি গভীর সমুদ্রে চলাচলরত জাহাজ, নৌকা ও মাঝিমাল্লাদের দিক নির্দেশনাসহ নানাভাবে উপকারে আসে। Radio Detection And Range এর সংক্ষিপ্ত নাম রাডার (Rader)। সমতল ভূমি থেকে ৬০ ফুট উচুঁ পাহাড়ের চূঁড়ায় প্রায় ৯৯ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ভবনের উপর রাডারটি স্থাপন করা হয়। জাপান ও বাংলাদেশ যৌথ কারিগরী সহযোগিতায় রাডার কেন্দ্র নির্মাণ ও রাডার স্থাপনে ৮ মাস সময় লাগে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয় ৫১ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা। ডপলার রাডারটি জাপান-বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এদেশের মানুষের জানমাল রক্ষার্থে সহায়ক হবে। এ রাডারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ভি সেটের মাধ্যমে সাথে সাথে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর জানতে পারে[৫]।

ছবি-১৪: রাডার স্টেশন, কক্সবাজার

সমস্যাঃ

ক)। টুরিস্ট স্পট হিসেবে প্রচারণা নাই

খ) টুরিস্টদের পরিদর্মনের সুযোগ কম

গ) সন্ধ্যার পরে নিরাত্তার অভাবের কারনে ওখানে যা যায়না

৩.১.৬। হিলটপ সার্কিট হাউজ

কক্সবাজার হিলটপ সার্কিট হাউজ লাবণী পয়েন্ট থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখান থেকে আপনি বঙ্গোপসাগরের পাশাপাশি কক্সবাজার শহরকেও দেখতে পাবেন ভিন্ন রূপে। এই সার্কিট হাউজটি কক্সবাজার লাইট হাউজের কাছে অবস্থিত। জেলা পরিষদ ভবনের পশ্চিম দক্ষিণে পাহাড়ের চুঁড়ায় মনোরম নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে হিলটপ সার্কিট হাউসের অবস্থান।হিলটপ সার্কিট হাউসে উঠার জন্য ঢেউ খেলানো বাঁকা রাস্তা । ঝিরিঝিরি বাতাসে ছায়াময় এই গাছ তলায় বসার পর আপনার দেহে ও মনে বয়ে যাবে প্রশান্তির ছোঁয়া। সমতল থেকে পাহাড়ের চুঁড়ায় উঠার সব ক্লান্তি ভুলে যাবেন মুর্হূতে সবুজ প্রকৃতির অপূর্ব কারু কাজের মায়ায়। সার্কিট হাউসের পাশে এই রাস্তা দিয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন রাখাইনদের স্মৃতি চিহ্ন দৃষ্টিনন্দন প্যাগোডা[৫]।

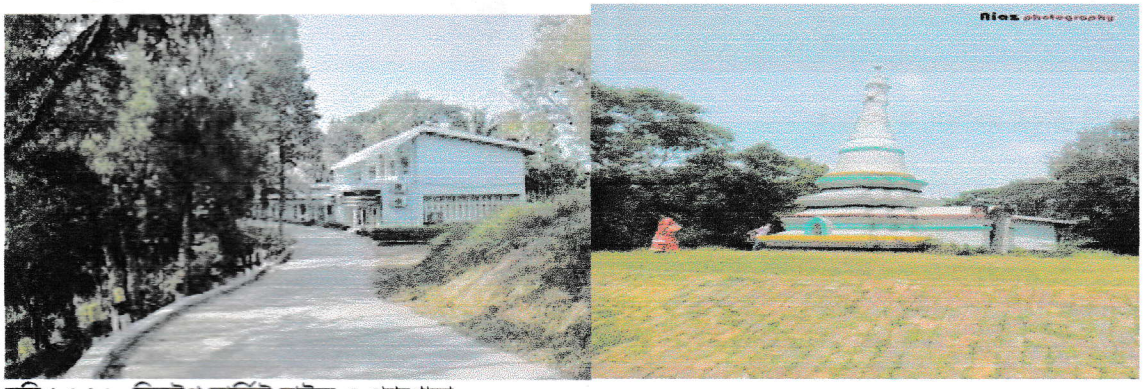

ছবি-১৫-১৬: হিলটপ সার্কিট হাউজ ও প্যাগোডা

সমস্যাঃ

ক) টুরিস্ট স্পট হিসেবে প্রচারণা নাই

খ) টুরিস্টদের পরিদর্মনের সুযোগ কম

গ) সন্ধ্যার পরে নিরাত্তার অভাবের কারনে ওখানে যা যায়না

৩.১.৭। ছাচি চৌধুরীর মসজিদ

ছাচি চৌধুরীর মসজিদ জেলার প্রাচীন স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মসজিদটি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড-বিজিবি তথা প্রাক্তন বিডিআর ক্যাম্পের উত্তর-কোণায় চৌধুরী পাড়াতেই অবস্থিত। অর্থ্যাৎ কক্সবাজার –চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্ব পাশেই মসজিদের অবস্থান। যখন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী সময়ে সড়কটি নির্মাণ করা হয়।''গ্রামের আদি পুরুষ ছাদি চৌধুরী উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেন। ফলে তার নামেই মসজিদের নামকরণ। মসজিদটির নির্মাণশৈলী মোগল আমলের মসজিদের আদলে। মসজিদের ভেতরে বাইরে মোগল আমলের মসজিদের ন্যায় করুকাজ করা। আয়তনে ছোট্ট মসজিদটির উত্তর পাশে রয়েছে একটি বিশাল দিঘি। মসজিদটির ভেতরে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ২৩ ফুট, পূর্ব-পশ্চিম লম্বা ১৪ ফুট। মসজিদের বাইরের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ৩৪ ফুট আর পূর্ব-পশ্চিম ২৬ ফুট। মসজিদ নির্মাণকালে নামায পড়ার জন্য তিনটি কাতার বা সারি করা হয়েছে। ইমাম দাঁড়ানবার বা মেহেরাবের ভেতরে কোনো জায়গা নেই বললেও চলে।

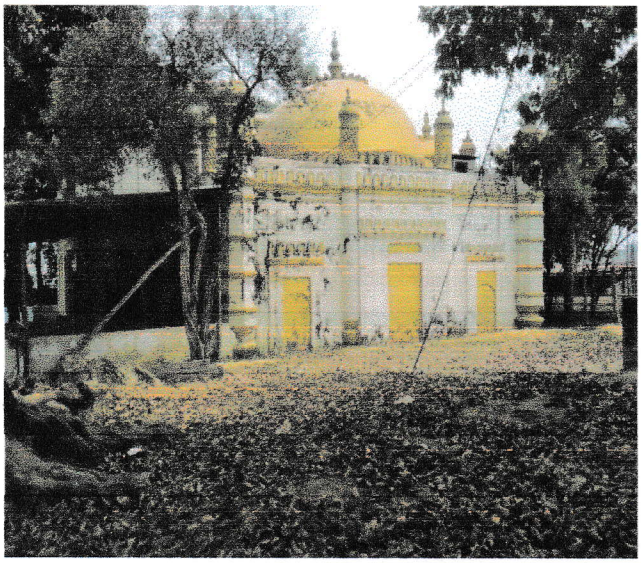

ছবি ১৭-১৮: ছাচি চৌধুরী মসজিদ, কক্সবাজার

মসজিদের জানালা, দরজা ও মেহেরাবের সাতে রয়েছে দৃশ্যমান দুটি করে মোট আটপিলার। এই পিলারগুলো আকারে ছোট। এসব পিলার দরজা, জানালা ও মেহেরাব নির্মাণ করা জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের ভিত্তি মাটির সাথে সমান্তরালে পিলার চারটি নির্মাণ করা হয়েছে। পাতিলগুলো দেখতে স্থানীয় ভঅবে গ্রামে ব্যবহৃত আইল্যা (মালসা) বা পিতলের চিলমচি (প্রাচীনকালে বৃড়াবুড়িরা স্থানীয় লোকজন মসজিদের ছাদের উপর রয়েছে পাশাপাশি তিনটি গম্বুজ। তিনটি রড দিয়ে বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, তা সাম্প্রতিক কালের বসানো হয়েছে আধুনিক কালের টাইলস। ফলে কত নিচে মূল ফ্লোর রয়েছে তা বলা মুশকিল। ১৮৬১ সালের দিকে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে[৩]।

সমস্যাঃ

ক) টুরিস্ট স্পট হিসেবে প্রচারণা নাই
খ) টুরিস্টদের পরিদর্মনের সুযোগ কম
গ) সন্ধ্যার পরে নিরাত্তার অভাবের কারনে ওখানে যা যায়না
ঘ) টমটম/রিক্সা/সিএনজি/রিক্সা ড্রাইভার কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়।

৩.১.৮। মেরিন ড্রাইভ

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক (৮০কিমি দৈর্ঘ্য) নির্মাণ প্রকল্পটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সামরিক কৌশলগত উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশের উদ্দেশ্যে গৃহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবকাঠামো প্রকল্প। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে নির্মিত এ সড়কটিকে বিশ্বের বৃহত্তম মেরিন ড্রাইভ সড়ক হিসেবে অবহিত করা হয়ে থাকে এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এ সৈকত কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত, যদিও একটি ক্রমশ: দক্ষিণ দিকে সরু হয়ে টেকনাফ গিয়ে শেষ হয়েছে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত একদিকে সাগর এবং অপর দিকে স্থলভাগে নিরবচ্ছিন্ন পাহাড় শ্রেণির সমন্বয়ে অসাধারণ সুন্দর এ ভূ-প্রকৃতির মাঝে আছে কম-বেশি ২শ মিটার প্রশস্ত সমতল করিডোর। সড়কটি বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক কৌশলগত ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও সড়কটি উক্ত উপকূলের জনগণক সাগরের জোয়ার ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা, লবণাক্ততার প্রভাব হ্রাস, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং বঙ্গোপসাগরের মৎস্য আহরণ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ উক্ত মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

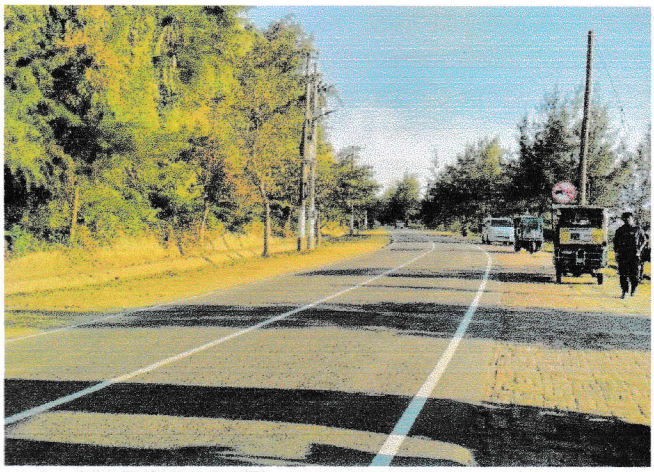

ছবি- ১৯: মেরিন ড্রাইভ, দরিয়ানগর, কক্সবাজার

১। সন্ধ্যার পরে টুরিস্টদের নিরাত্তার অভাব
২। আলোকায়নের অভাব

৩.১.৯। নাজিরার টেক শুটকি পল্লী

কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলের নাজিরারটেক এলাকা।নাজিরারটেক উপকূলের ১৯টি গ্রামে গড়ে উঠেছে দেশের সর্ববৃহৎ শুঁটকিমহাল। যেখানে রয়েছে ছোট-বড় ৯৫০টি মহাল। এলাকাটি পড়েছে কক্সবাজার পৌরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে।৯ শতাধিক মহালে শ্রমিক রয়েছেন ২৫ হাজারের বেশি। এর মধ্যে অন্তত ১৮ হাজার নারী। নাজিরারটেক, কুতুবদিয়া পাড়া, সমিতি পাড়া, নুনিয়াছটা, ফদনারডেইলসহ অন্তত ১৯টি গ্রামে ৭০ হাজারের বেশি মানুষের বসবাস। এর ৯০ শতাংশ মানুষ শ্রমজীবী—দেশের বিভিন্ন উপকূল থেকে জলোচ্ছাস ও দুর্যোগের কবলে ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি হারিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। শুঁটকিমহালসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে 'নাজিরারটেক মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি'। তাদের সদস্যসংখ্যা ১ হাজার ১১৭। জেলা মৎস্য বিভাগের তথ্যমতে, গত বছর নাজিরারটেকের মহালসমূহ থেকে শুঁটকি উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ২১ হাজার মেট্রিক টন। চলতি মৌসুমে শুঁটকি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৬ হাজার মেট্রিক টন। যার বাজারমূল্য ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা[৫]।

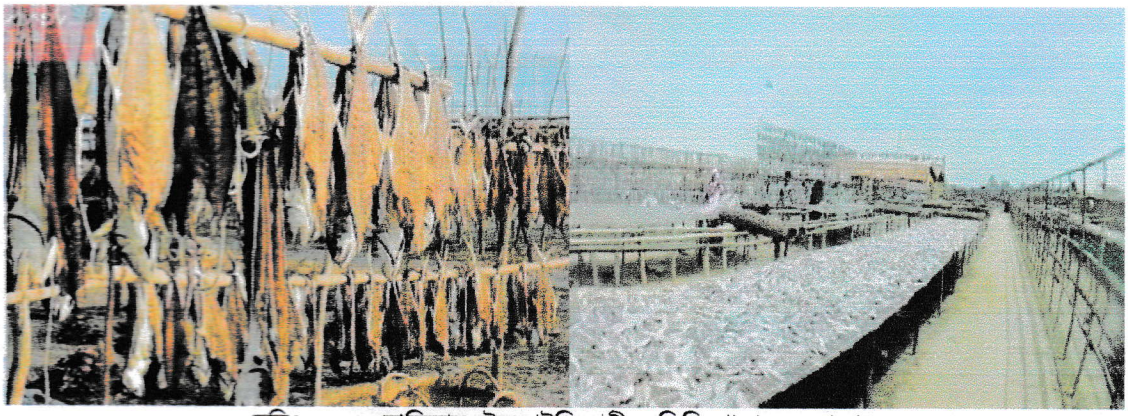

ছবিঃ২০-২১: নাজিরার টেক শুটকি পল্লী, সমিতি পাড়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) টুরিস্ট স্পট হিসেবে প্রচারণা নাই
খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নাই
গ) সন্ধ্যার পরে নিরাত্তার অভাবের কারনে ওখানে যা যায়না
ঘ) টমটম/রিক্সা/সিএনজি/রিক্সা ড্রাইভার কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়।

৩.১.১০। দরিয়ানগর পার্ক

দরিয়ানগর কক্সবাজারের দক্ষিণ শহরতলির শহর যা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মনোরম। কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ সড়ক ধরে কলাতলী মোড় থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার পূর্বদিকে এই দরিয়ানগর। বোরোচোরার পক্ষগুলিতে অত্যন্ত সুন্দর প্যানোরামিক সবুজ দৃশ্য রয়েছে যা পশ্চাদপসরণের জন্য আদর্শ। এই বন ঘন বাঁশ গাছ, কোরাই, মহোগানি, চাপালিশ, সেগুনে পূর্ণ। বিভিন্ন ধরণের পাখি রয়েছে যা পাহাড় জুড়ে বাস করে। কিছু বুনো বানরের দল রয়েছে যারা ছোট বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার জন্য খোলামেলা মনোভাব নিয়ে খালের জলে নেমে আসে।

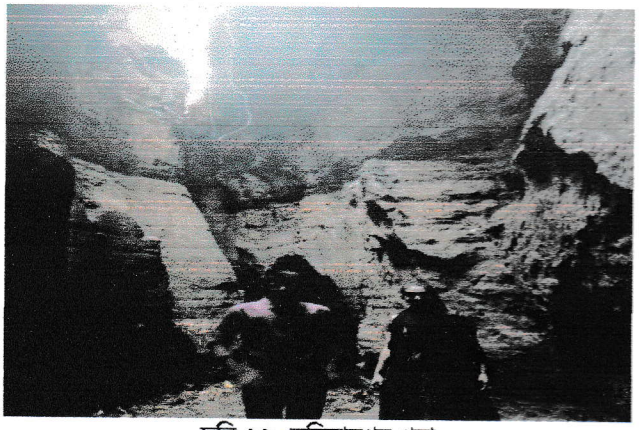

ছবি-২২: দরিয়ানগর গুহা

দরিয়া নগরের গুহা সম্পর্কে কক্সবাজারের মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। অনেক আগে আরব বণিকেরা বাণিজ্য করতে জাহাজে করে এই জায়গায় এসেছিল। এর মধ্যে এক সময় নাবিক শাহেনশাহ এক বণিক নৌকায় বঙ্গোপসাগরের এই তীরে এসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নৌকা নদীর মাঝখানে ডুবে গেলে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে, নাবিক, জিনিসপত্র এবং জিনিসপত্রের সমস্ত লোক সমুদ্রে হারিয়ে গেল।

ছবি-২৩: দরিয়ানগর প্যারাসাইলিং

ছবি-২৪: দরিয়ানগর পার্ক

ছেলেবেলায় পাখি হয়ে আকাশে উড়ার স্বপ্ন আমাদের সকলেরই ছিল। আকাশের বুকে ডানা মেলে দিগন্তে হারিয়ে যাওয়ার এক অলীক স্বপ্ন। দরিয়া নগরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এই প্যারাসেইলিং। এখানে একটা প্যারাসুটে আপনাকে বেঁধে দেয়া হবে, একটি উচ্চগতি সম্পন্ন স্পীড-বোট আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে সমুদ্রে, আর সেই তীব্র গতিতে আপনি ঠিক একটা ঘুড়ির মতই উড়ে যেতে থাকবেন। সমুদ্রের উপর আকাশে উড়বার এই অসাধারণ অভিজ্ঞতা আপনার স্মৃতির পাতায় থাকবে চিরকাল। এই অনন্য থ্রিলিং এর স্বাদ আপনি শুধুমাত্র এই সৈকতেই পাবেন[৬]।

সমস্যা সমূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা

খ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।

গ) ভংগুর ঝুলন্ত ব্রিজ

ছবি-২৫: ভংগুর ঝুলন্ত ব্রীজ, দরিয়ানগর পার্ক

ছবি-২৬: ঝুকিপূর্ন বাশের রেলিং, দরিয়ানগর পার্ক

ঘ) পাহাড়ে ওঠার জন্য ঝুকিপূর্ন বাশের রেলিং

ঙ) বিনোদনের কোন অবকাঠামো নাই

চ) পর্য্যটকেরা হকার, ক্যামরাম্যান, কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়।

ছ) ব্যয়বহুল পারাসাইলিং

জ) পাবলিক টয়লেট নাই

ঝ) গাড়ী পার্কিং নাই

৩.১.১১। ফিশারী ঘাট/ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র:

শহরের পশ্চিম নতুন বাহারছড়াস্থ বাঁকখালী নদীর তীরে অবস্থিত স্থানটির নাম বিএফডিসি ঘাট বা ফিশারীঘাট, কক্সবাজারের মাছের প্রধান আড়ত।বঙ্গোপসাগর থেকে আহরিত মৎস্য এখানেই নামানো হয়। এখান থেকেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা প্রসেসিং সেন্টারে মাছ সরবরাহ হয়। এটি ফিসারীজ ঘাট নামেও পরিচিত। এই ঘাট থেকে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করে। বছরের সবদিনই এখানে থাকে জনকোলাহল। শহর থেকে রিক্সা যোগে গিয়ে যে কেউ পছন্দের কাচা মাছ কিনতেও পারেন।

ছবি-২৭-২৮: মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, কক্সবাজার

৩.১.১২। লবণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা:

ইসলামপুর, নাপিতখালী এলাকা থেকে বাংলাদেশের চাহিদার ৮৫% লবণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপনন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের নামকরা লবণ বিক্রয় ও বিপনন প্রতিষ্ঠান গুলো এখান থেকেই লবণ সংগ্রহ করে। কক্সবাজার শহর থেকে ৩৫ কি:মি: দূরে এর অবস্থান।টেক্সী কিংবা মাইক্রোবাস যোগে বেড়ায়ে আসা যাবে। তা'ছাড়া চট্টগ্রামগামী বাসে চড়ে ইসলামপুর ষ্টেশনে নেমেও যাওয়া যাবে।

ছবি-২৯: লবনের খামার, ইসলামপুর, কক্সবাজার

৩.১.১৩। ঐতিহ্য লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর:

কক্সবাজারের হাজার বছরের ঐতিহ্য লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর। যা অবৈধ দখল এবং অযত্ন অবহেলায় ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছিল। তাই কক্সবাজারের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পর্যটক ও স্থানীয় জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।ওয়াকওয়ে, মসজিদ সংস্কার, স্যুভিনিয়র শপ, কমিউনিটি বিল্ডিং, স্ন্যাক্স বার, ট্যুরিস্ট ডেক্স, ট্যুরিস্ট তথ্য কেন্দ্র, সাইকেল পার্কিং স্ট্যান্ড, সুপরিসর পাবলিক টয়লেট, ল্যান্ডস্কেপিং, এম্পিথিয়েটার, ড্যান্সিং ওয়াটার ফাউন্টেন্ট, লাইব্রেরী ইত্যাদি সহকারে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে কক্সবাজারে আগত পর্যটকসহ স্থানীয় জনসাধারণের চিত্র বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে[৪]।

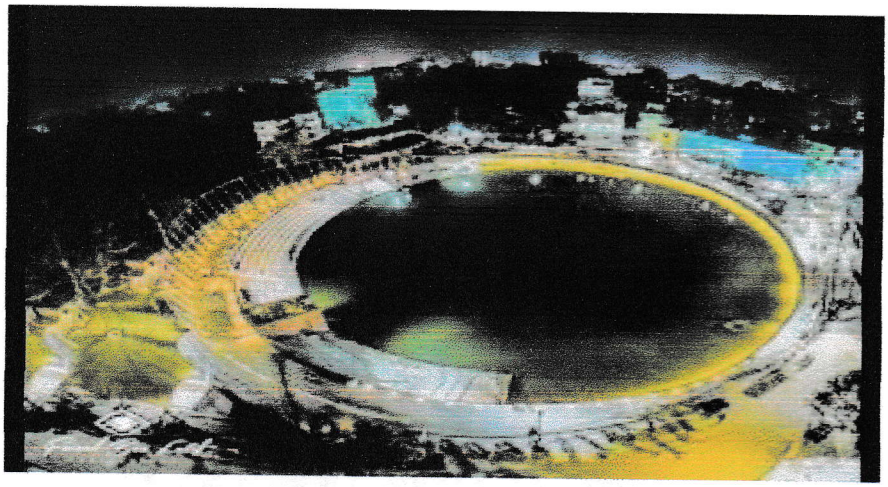

ছবি-৩০: গোল দিঘী, কক্সবাজার পৌরসভা

৩.১.১৪ রেডিয়্যান্ট ফিসওয়ার্ডঃ

সমুদ্রের গভীরে আশ্চর্য জীবন আর রহস্যময় প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠের থেকেও বেশি বৈচিত্র্যময়। উন্নত বিশ্বে এই বর্ণিল রাজত্ব দেখার নানা মাধ্যম থাকলেও আমাদের দেশে আগে তেমন সুবিধা ছিলো না। সমুদ্র ও মিঠা পানির বিস্ময়কর এই জলজীবন মানুষের সামনে তুলে ধরতে ও তাদের আগ্রহ মেটাতে কক্সবাজারে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র মেরিন ফিশ একুরিয়াম।পর্যটন নগরী কক্সবাজার শহরের ঝাউতলায় বিনোদনের নতুন সংযোজন এই ফিশ মিউজিয়ামে আছে সাগর ও মিঠা পানির প্রায় ১০০ প্রজাতির মাছ। বিরল প্রজাতির মাছ সহ এখানে আছে হাঙ্গার, পিরানহা, শাপলাপাতা, পানপাতা, কাছিম, কাঁকড়া, সামুদ্রিক শৈল, পিতম্বরী, সাগর কুঁচিয়া, বোল, জেলিফিস, চেওয়া, পাঙ্গাস, আউস সহ আরও অনেক মাছ ও জলজ প্রাণী।

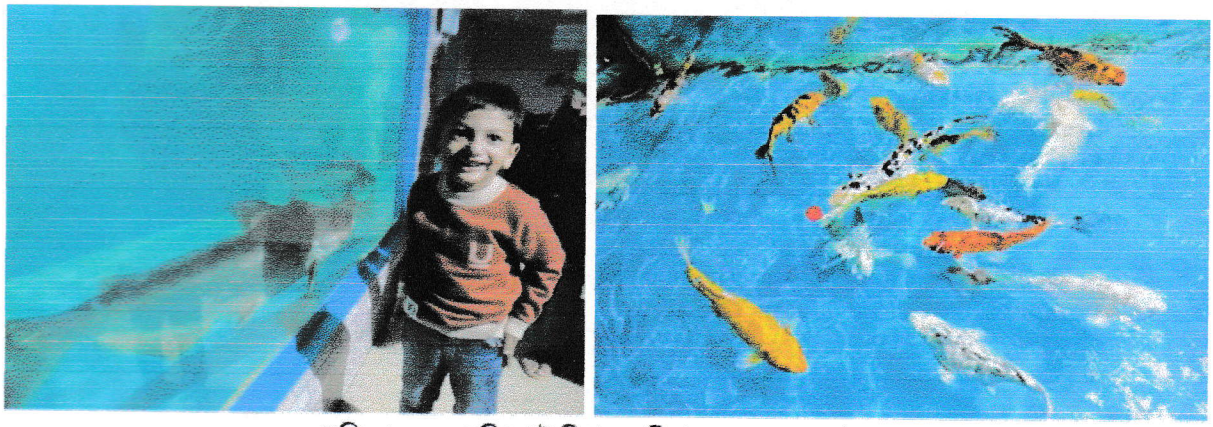

ছবি-৩১-৩২: রেডিয়্যান্ট ফিশ একুরিয়াম, কক্সবাজার পৌরসভা

সমস্যাঃ

ক) প্রবেশ মূল্য ৩০০/- যা অনেক বেশি বলে অনেকে মনে করেন।

৩.২ রামু উপজেলাঃ

৩.২.১। হিমছড়ি

হিমছড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত একটি পর্যটনস্থল। কক্সবাজার থেকে এটি ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।[১] হিমছড়ির একপাশে রয়েছে সুবিস্তৃত সমুদ্র সৈকত আর অন্যপাশে রয়েছে সবুজ পাহাড়ের সারি। হিমছড়িতে একটি জলপ্রপাত রয়েছে যা এখানকার প্রধান পর্যটন আকর্ষণ। যদিও বর্ষার সময় ছাড়া অন্যান্য অনেক সময়ই ঝরণায় পানি থাকে না বা শুষ্ক থাকে। তবুও প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসেবে হিমছড়ি, পর্যটকদের অনন্য এক আকর্ষণ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এ সমুদ্র সৈকতের নাম হিমছড়ি।

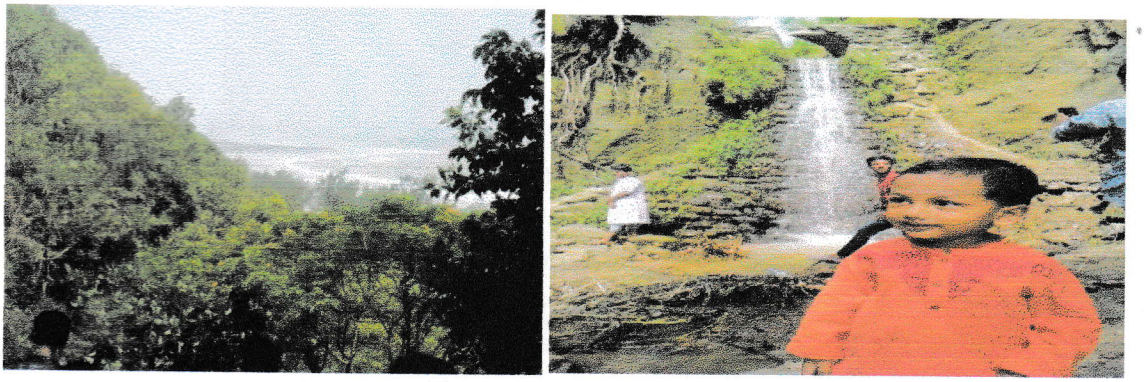

ছবি-৩৩-৩৪: হিমছড়ি পাহাড় ও ঝর্ণা, রামু, কক্সবাজার

ভঙ্গুর পাহাড় আর ঝর্ণা এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কক্সবাজার থেকে হিমছড়ি যাওয়ার পথে বামদিকে সবুজঘেরা পাহাড় আর ডানদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করে[৫]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা
খ) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
গ) পাহাড়ে ওঠার জন্য ঝুকিপূর্ন বাশের রেলিং

ছবি-৩৫: হিমছড়ি পাহাড়ে, ঝুকিপূর্ণ বাশের রেলিং

ঘ) বিনোদনের কোন অবকাঠামো নাই
ঙ) পর্য্যটকেরা হকার, ক্যামরাম্যান, কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়।
চ) পাবলিক টয়লেট নাই
ছ) বিনোদনের জন্য কোন অবকাঠামো নাই

৩.২.২। রামু রাবার বাগান

পাহাড়ি টিলা আর সবুজ ও সুশৃঙ্খল গাছের ছায়াতলে যদি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান, তাহলে রামু রাবার বাগান আপনার জন্য একটি আদর্শ স্থান। কক্সবাজার থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে রামু উপজেলায় এর অবস্থান। সারা বছর ভ্রমণের উপযোগী একটি জায়গা। সারি সারি রাবারগাছের বাগানে ঢুকলে মন হারিয়ে যায় সবুজের সমারোহে। যতই ভেতরে ঢুকবেন ততই যেন বিশালতা মুগ্ধ করবে আপনাকে। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য। নিবিষ্ট মনে প্রকৃতিতে অবগাহন করতে করতে কখন বেলা গড়িয়ে যাবে টেরও পাবেন না।১৯৬০ সালে বন বিভাগ অনাবাদি জমি জরিপ করে পরীক্ষামূলকভাবে রাবার উৎপাদনের জন্য ৭১০ একরের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে।বর্তমানে দুই হাজার ৬৮২ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত বাগান। এর মধ্যে এক হাজার ১৩০ একর এলাকা থেকে লিকুইড বা কষ সংগ্রহ করা হচ্ছে।রাবার বাগানে বর্তমানে উৎপাদনক্ষম গাছ রয়েছে প্রায় ৫৮ হাজার। এসব গাছ থেকে বছরে প্রায় আড়াই লাখ কেজি রাবার উৎপাদন হয়। প্রতিদিন দুই হাজার কেজি রাবার উৎপাদন করা হয় বাগানের কারখানায়।

ছবি-৩৬: রাবার বাগান, রামু, কক্সবাজার

সাধারণত শীতকালে রাবার কষ উৎপাদন বেশি হয়। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি কষ আহরণের উৎকৃষ্ট সময়। বর্ষাকালে কষের উৎপাদন কমে যায়। গ্রীষ্মকাল থেকে অল্প পরিমাণে বাড়তে থাকে। সপ্তাহে এক দিন রাবার কষ সংগ্রহ করা হয়। পাহাড়ি ও সমতলের লোকেরা মজুরির ভিত্তিতে কষ সংগ্রহ করে কারখানায় এনে প্রক্রিয়া করার জন্য জমা করেন[৭]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের কোন অবকাঠামো নাই
গ) পাবলিক টয়লেট নাই

৩.২.৩। ক্যাপ্টেন কক্সের বাড়ীঃ

কক্সবাজার শহর থেকে রামুর ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের বাংলোবাড়ির দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। এই বাড়িই ২২০ বছর আগে তৈরি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের বাংলোবাড়ি, তা অনেকেই জানে না। কক্সবাজারের রামু উপজেলার চৌমুহনী স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকে দুই কিলোমিটার পথ পার হলেই সেই গ্রাম পেয়ে যাবেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন 'হিরাম কক্স'-এর বাংলোবাড়ি। যাঁর নামে এখন এই কক্সবাজার জেলা।১৭৮৪ সালের দিকে আরাকান দখল করে নিয়েছিলেন বার্মার রাজা বোধাপায়া। রাজার আক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রায় ১৩ হাজার আরাকানি এদিকে চলে আসে, আশ্রয় নেয় পালংকীতে। সমুদ্র ও জঙ্গলঘেরা পালংকীতে আশ্রিত লোকজনকে পুনর্বাসনের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে সেখানে নিয়োগ দিয়েছিল। হিরাম কক্স পালংকী এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন একটি বাজার। প্রথম প্রথম এ বাজার 'কক্স সাহেবের বাজার' নামে পরিচিত ছিল। পর্যায়ক্রমে 'কক্স-বাজার' এবং 'কক্সবাজার' নামের উৎপত্তি ঘটে। জায়গাটি 'প্যানোয়া' নামেও পরিচিত। 'প্যানোয়া' শব্দের অর্থ 'হলুদ ফুল'। তখন কক্সবাজার হলুদ ফুলের রাজ্য ছিল।হিরাম কক্স তো দায়িত্ব নিয়েছিলেন শরণার্থী পুনর্বাসনের। কিন্তু তাঁকে তো রাত যাপন করতে হবে, করতে হবে দাপ্তরিক কাজ! এ জন্যই রামুতে নির্মিত হয় এই বাংলোবাড়ি। ১৭৯৯ সালে বাংলোবাড়িতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ক্যাপ্টেন কক্সের মৃত্যু হয়[৮]।

ছবি-৩৭: ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের বাড়ী, রামু, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা
খ)সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
গ) বিনোদনের কোন অবকাঠামো নাই
ঘ) পাবলিক টয়লেট নাই
ঙ) গাড়ী পার্কিং নাই
চ) ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই

৩.২.৪। কক্সবাজার বোটানিক্যাল গার্ডেনঃ

ছবি-৩৮-৩৯: রাজারকুল বোটানিক্রাল গার্ডেন, রামু, কক্সবাজার

কক্সবাজার বোটানিক্যাল গার্ডেন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য নতুন সংযোজন। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ আর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি কক্সবাজারে পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে এটি গড়ে তোলা হয়েছে।রামু উপজেলার রাজারকুলে বন বিভাগের ২৫০ একর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে দেশের অন্যতম এ ইকোট্যুরিজম বোটানিক্যাল গার্ডেন। প্রাথমিকভাবে ৬০ একর জমিতে কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে একদিকে যেমন পর্যটক আকৃষ্ট হবে, অন্যদিকে সরকার পাবে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। এ গার্ডেন কক্সবাজারে পর্যটনের আরেকটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য নতুনভাবে একটি রেঞ্জ অফিস, চারটি নার্সারি, কপি হাউস, বাউন্ডারি ওয়াল, দুটি ব্রিজ, আটটি টয়লেট, দুটি ছাতা ও ছয়টি বেঞ্চ স্থাপনের কাজ চলছে। দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬০ একর জমির ওপর প্রথম ফেজের কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে।

সমস্যা সমূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা
খ)সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
গ) বিনোদনের কোন অবকাঠামো নাই
ঘ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঙ) কোন আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.২.৫। রামকুট তীর্থধামঃ

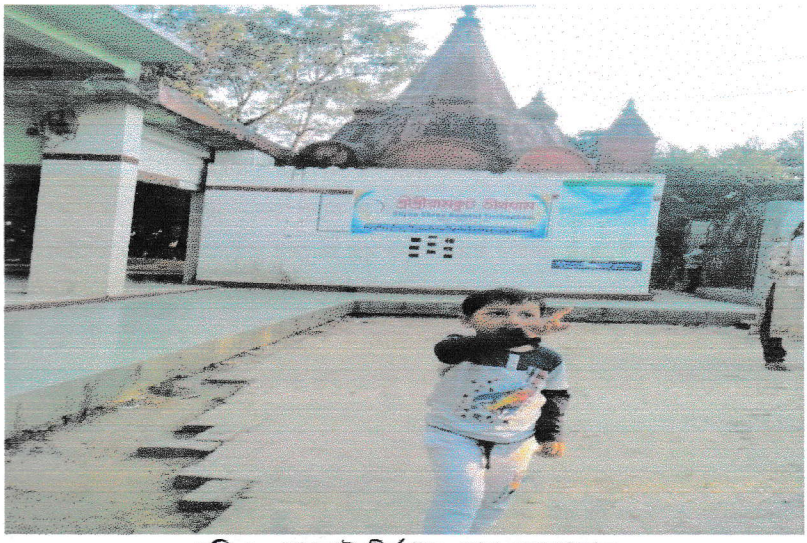

ছবি-৪০: রামকুট তীর্থধাম, রামু, কক্সবাজার

কক্সবাজার সদর তেকে রামুর দুরত্ব ১৫ কিলোমিটার। রামু জেলার একটি প্রাচীন জনপদ। গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি'র ভূগোলে, তিব্বতি লেখক লামা তারানাথ-এর বিবরণে রামুর কথা উল্লেখ আছে। রামু নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তি রয়েছে। তৎমধ্যে বনবাসে থাকাকালে রাম ও সীতা এসেছিলেন রামকোট এলাকায় এবং রামের নামানুসারে রামকোট কিংবা রামুর নামকরণ করা হয়েছে। পাঁচটি বড় বড় বটগাছ নিয়ে পঞ্চমটি বন। রামকোটে বড় বড় পাঁচটি বট গাছ রয়েছে। তাই রামকোটকে রামায়নের পঞ্চবটি বন বলেও কেউ কেউ মনে করে থাকেন। সীতার মরিচ পিষার পাটা রামকোটে রয়েছে বলে ধারণা করে একটি কালো পাথরকে পুজো কের থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন।রামকোটের হিন্দু মন্তির ও তীর্থধামটি বনাশ্রমের পাশেই অন্য একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৯৪ সালে। আবার কারো মতে রামকোট তীর্থধামের হিন্দু-মন্দিরটি ১৭ শতকে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানক্য কর্তৃক নির্মিত হয়। রাজসিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত রাজা গোবিন্দ মানিক্য রামকোট আরাকানি প্রশাসকের আশ্রয়ে থেকে এখানে স্থাপন করেন বনাশ্রম। কথিত আছে, ভাই আত্তরঙ্গজেবের রোষানল থেকে পালিয়ে আরাকান যাবার পথে শাহসুজা ও রাজা গোবিন্দ মানিক্যের সাথে রামকোটে সাক্ষাত হয় । সময়ের গহ্বরে বিস্মৃতির আড়ালে রামকোট একসময় বিলীন হয়ে পড়লে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীলংকা থেকে আগত বৌদ্ধ পুরোহিত জগৎজ্যোতি মহাস্থবির বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে রামকোট বৌদ্ধ বিহারটি আবিষ্কার ও সংস্কার করেন।বর্তমান রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ-বিহার ও রামকোট তীর্থ-ধামের মাঝামাঝি জায়গায় পাহাড়ের পাদদেশে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা-এনজিও দেশি-বিদেশি দাতা ও সমাজসেবকদের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে 'জগৎজ্যোতি শিশু সদন' নামে একটি বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম। ১৯৬৩ সালে এখানে মাটি খনন করতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছিল তিনটি মূল্যবান ধাতব মদ্রিা। প্রাপ্ত মুদ্রার ভিত্তিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আবদুল করিম এখানকার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। মুদ্রা তিনটি বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে[৩]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা
খ) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
গ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
ঘ) ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই

৩.২.৬। রাংকুট বৌদ্ধ মন্দিরঃ

রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারকে কেন্দ্র করে এক সময় এ অঞ্চলে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট অশোক এটি স্থাপন করেন। অনেকের কাছে এটি রামকোট বৌদ্ধ বিহার নামেও পরিচিত। রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নে সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে প্রাচীন আরাকানের ধন্যবতী (ধাঈয্যাওয়্যাদি) নগরের রাজা মহাচন্দ্র সুরিয়ার আমন্ত্রণে গৌতম বুদ্ধ তার শিষ্যদের নিয়ে তৎকালীন সমতটের চৈতগ্রামের (বর্তমান চট্টগ্রাম) উপর দিয়ে ধন্যবতী নগরে যাওয়ার পথে এই স্থানে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। তখন তার প্রধান সেবক আনন্দ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করে ভবিষ্যত বাণী করে বলেন, "হে আনন্দ! পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব তীরে রম্যবতি (রম্মাওয়্যাদি) নগরের পর্বত শীর্ষে আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে, তখন এর নাম হবে রাং (বুদ্ধের বুকের অস্থি) কূট (স্থান)। সম্রাট অশোক বুদ্ধের ৪৫ বছর ব্যাপী ৮৪ হাজার ধর্মবানীকে বুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীকরূপে বুদ্ধের অস্থি সংযোজিত ৮৪ হাজার চৈত্য স্থাপন করেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম রামুর এ চৈত্যটি। পরবর্তিতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০৮ অব্দে আরাকান রাজা চন্দ্রজ্যোতি (চেঁদি রাজা) কর্তৃক বুদ্ধের উক্ত বক্ষাস্থি সাদা পাথরের ৬ ফিট উঁচু বুদ্ধবিম্বের মাথায় সংযোজিত করে বুদ্ধবিম্বটি স্থাপন করেন। সময়ের বিবর্তনে রাংকূটের অস্তিত্ব বিলীন হল হয়ে যায়। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীলংকান পুরোহিত জগৎ জ্যোতি মহাস্থবির রামকোট বৌদ্ধ বিহারটি সংস্কার পূর্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন[৩]।

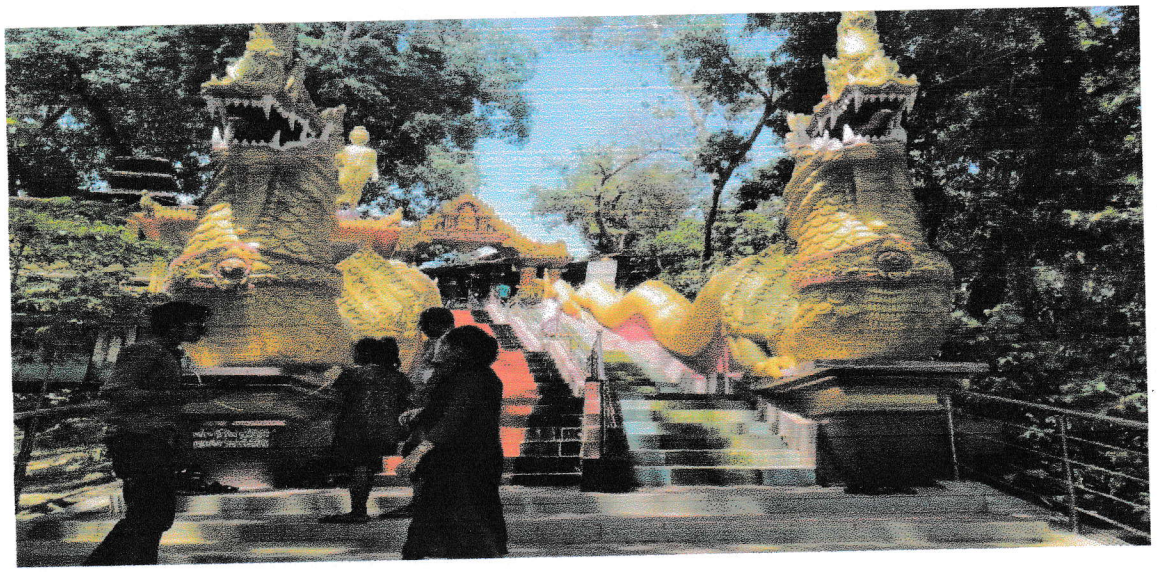

ছবি-৪১: রাংকুট বৌদ্ধ মন্দির, রামু, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) আবাসিক সুবিধা নাই

৩.২.৭। লামার পাড়া বৌদ্ধ বিহার

রামু উপজেলার অফিসের চরের পশ্চিমপাশে লামারপাড়া গ্রাম। এই গ্রামেই লামারপাড়া বৌদ্ধবিহার অবস্থিত। বিহারটি বর্তমানে অযত্নে অবহেলায় আছে। একজন বিহরাগত ভিক্ষু সেখানে অভস্থান করেন এবং একটি বহিরাগত মঘ পরিবার বিহার বসবাস করেন। তারাই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমে চোখে পড়ে মূল বিহারটি। উত্তর মুখি, বার্মাটিক (সেগুন) কাঠ দ্বারা বিহার নির্মিত। সামনে সিঁড়ি বারান্দা। দু'পাশে দুটা নড়বড়ে সিঁড়ি। ৪৯ টি খুঁটি বা ঠুনির উপর দ্বিতল ঘর। দেখেতে অন্যান্য রাকখাইং বিহারের মতোই। বিহারের দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট X প্রস্তথ ৫১ ফুট। খুঁটির বেড় ৪৪ ইঞ্চি। উচ্চতায় ৫০ ফুটের মতো। বর্তমানে বিহারটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও মলিন অবস্থায় দণ্ডায়মান। এই কারণে বিহারটিকে পরিত্যক্ত অভস্থায় রাখা হয়েছে। বিহারের

বুদ্ধমূর্তিগুলি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই বিহারটি তৈরি করেন ঐ গ্রামের (লামারপাড়া) বিখ্যাত জমিদার থোয়াইঙ্খ্য সওদাগর। ফতেখাঁরকুল, নাশিরকুল, রাংকোট, কাঠালিয়া পাড়া, দাড়িয়ার দিঘি এলাকায় তাঁর জমিদারি ছিল। তিনি ১২৬৬ মঘাব্দের (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে উক্ত বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিহারকে অনেকে থোয়াইঙ্খ্য সওদাগরের ক্যাং বলে।

লামারপাড়া ক্যাং তথা কোয়াইঙ্খ্য সওদাগরের ক্যাং এর মধ্যে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় ঘন্টা। এই ঘন্টার জন্য রয়েছে পৃথক ঘর। ঘরটি অস্টকোনাকৃতির, আটটি খুঁটির উপর উক্ত ঘর নির্মিত। নিচের দিকে খোলা। শুধু ছাতার মেতা চূড়াকৃতির চালটাই আছে। চাল তিন ধাপ বিশিষ্ট এবং কাঠের সুন্দর করুকাজ করা। এই ঘরে দুটি বড় বড় ঘন্টা টাঙানো আছে। একটি সামান্য ছোট। যে লৌহশিকলে টাঙ্গানো আছে তাও করুকার্য খচিত এবং সিংহ মূর্তি অংকিত। তিনটি বড় বড় সিমেন্টের পিলারের উপর একটি বড় কাঠের বিরালি (কড়িকাঠ) বসানো। সেই বিরালি দুই ফটকে ঘন্টা দুইটি টাঙানো। পিলারে বেড় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ঘন্টা দুইটি গোলাকার, উপরের অংশ চূড়াকৃতির। ঘন্টার নিচের মুখের বেড় সাড়ে ৯ ফুট এবং উচ্চতা ৪৮ ইঞ্চি এবং পুরুত্ব ৫ ইঞ্চি মধ্যখানে সুরঙ্গযুক্ত। কাঠের বড় মুগুর বা গদা দিয়ে আঘাত করলে গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা যায় বলে কথিত। এক একটা ঘন্টার ওজন ৮০ মন বলে জানা যায়[৩]।

সমস্যামূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা
খ) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
গ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
ঘ) ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই

৩.২.৮। লাওয়ে জাদি (প্যাগোডা)

বাঁকখালি নদীর তীরে বড় ক্যং-এর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তর পূর্বকোণে তাকালে দেখা যায় পাহাড়ের উপর একটি সোনালি রংয়ের জাদি। মনে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে দর্শনার্থীদের। এই জাদির নাম 'লাওয়ে জাদি'। এই জাদিটিই রামুর বিখ্যাত প্রাচীন বিস্ময়কর নিদর্শন। যে পাহাড়শ্রেনি দৃষ্টিগোচর হয় তা কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের লট (লাট) উখিয়ার ঘোনার পাহাড়। ফতেখাঁরকুল ইউয়িননের হাইটুপি বা হাইটুবি মৌজার পূর্ব ও উত্র প্রান্ত জুড়ে এই পাহাড়শ্রেনি বৃটিশশাসনামলে বোম্বাইয়া লাট বা ধনীপুদ্রের জমিদারির অংশ ছিল বলে উক্ত পাহাড়শ্রেনিকে লট উখিয়ার ঘোনা বলে। উখিয়ার গেঅনা নামটিও আরাকানি নাম। পূর্বে এই উখিয়ার ঘোনার নাম ছিল লাওয়ে মুরং) ছিলেন আরাকানরাজের প্রধান সেনাপতি। বর্মিরাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রেফতার এড়ানোর উদ্দেশ্য সৈন্যসহ রামুর হাইটুপ মৌজায় এস বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে উক্ত পাড়ার নাম হয় লাওয়ের পাড়া। তাঁর আবাদকৃত ঘোনার নাম হয় লাওয়ের ঘোনা[[৮]।

সমস্যামূহঃ

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন কার্য্যক্রম নাই যেথাসে সেখানে ময়লা আবর্জ্যনা
খ) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
গ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
ঘ) ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই

৩.২.৯। ভূবনশান্তি ১০০ ফুট সিংহ শয্যা গৌতম বুদ্ধ মূর্তি

এই ভাবনা কেন্দ্রটি তৈরী হয়েছে ২০০২ সালে। শ্রীমত করুনাশ্রী ভিক্ষু ২০০২ সালে ০২ একর জায়গায় এই বিমুক্তি বিদরশন ভাবনা কেন্দ্র বৌদ্ধ বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত এটি বৌদ্ধদের ধর্মীয় উপপসনা ও ধর্মী শিক্ষাকেন্দ্র। এখানকার মূল আকর্ষণ টিলার উপর ভূবন শান্তি ১০০ ফুট লম্বা সিংহ শয্যা গৌতম বুদ্ধ মূর্তি। ২০০৯ সালে এর নির্মান কাজ শেষ হয়।

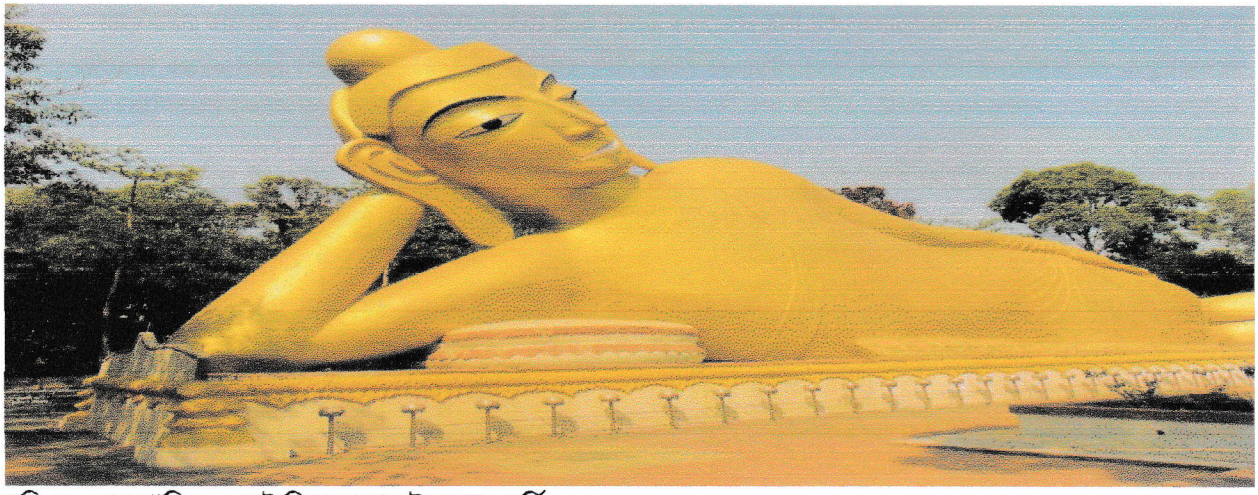

ছবি-৪২: ভূবনশান্তি ১০০ ফুট সিংহ শয্যা গৌতম বুদ্ধ মূর্তি

সমস্যা সমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই

৩.২.১০। কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার, রামুঃ

১৭০৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধবিহার রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার কক্সবাজার জেলার রামু থানার মেরংলোয়া গ্রামে অবস্থিত। কয়েক বছর আগে এই বিহারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে পুড়ে ছাই হয় পাঠাগারসহ পুরো বিহারটি। ঘটনার পর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সরকার প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর দৃষ্টিনন্দন ১৯টি বিহার নির্মাণ করে দেয়। স্থানীয়ভাবে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হলে এগিয়ে আসে প্রথম আলো ট্রাস্ট।সীমাবিহারের তৃতীয় তলায় গড়ে তোলা হয় একটি পাঠাগার। ধর্মীয় গুরু সত্যপ্রিয় মহাথেরোর নামে পাঠাগারের নামকরণ করা হয় 'পন্ডিত সত্যপ্রিয় পাঠাগার'। সেখানে ৩০ হাজার বই রাখার উপযোগী একাধিক তাক এবং অন্তত ৪০ জন বসে পড়ার মতো টেবিল-চেয়ার যুক্ত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে পাঠাগারে স্থাপন করা হয় চারটি কম্পিউটার।করোনা মহামারি শুরু হলে পাঠাগারটি বন্ধ ছিল। সম্প্রতি পাঠাগারটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে পাঠাগারটি[৮]।

ছবি-৪৩: কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার, রামু

সমস্যা সমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) গাড়ী পার্কিং নাই

৩.২.১১। মেরংলোয়া বিহারঃ

' মেরংলোয়া সীমা বিহার'। মূল বিহারটি রাকখাইং বিহারের আদলে তৈরি। পূর্বমুখি কাঠের দোতলা ঘর। নিচের অংশ খোলা, তলা পাকা। ধর্মসভা ও অন্যান্য সমাবেশাদি এখানেই আয়োজন করা হয়। সামনের দিকে দ'পাশে দুইট কাঠের সিঁড়ি। বিহারের উচ্চতা ৫০ ফুটের মতো। বিহারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৬খ্রিষ্টাব্দ। উক্ত বিহার ঝড়ে বিনষ্ট হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পুনঃরায় তৈরি করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সেই ভবনটিও দুষ্কৃতিকারীদের দেয়া আগুনে পুড়ে গেছে। ফলে এখন সম্পূর্ণ নতুন আঙিএক, নতুন নির্মাণশৈলি ব্যবহার করে ইট-সুরকি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমান বিহারের পূর্বেও গ্রামে বিহার ছিল। উক্ত বিহার বিনষ্ট হওয়ায় বর্তমান বিহারটি তৈরি করা হয়। বিহারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ, ১১১২ বঙ্গাব্দ। পরবর্তীকালে উক্ত বিহারটি তৈরি করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে দুষ্কৃতিকারীদের দেয়া আগুনে বিহারটি পুড়ে যায়। বর্তমানে সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশল বিভাগ নতুন আঙ্গিকে , নতুন নির্মাণশৈলী ব্যবহার করে ইট সুরকি দিয়ে নির্মাণ করেছে।

সমস্যা সমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) গাড়ী পার্কিং নাই

৩.২.১২ কানা রাজার সুড়ংগঃ

কক্সবাজারের রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের উখিয়ারঘোনা নামক দুর্গম এলাকায় প্রাচীন ঐতিহ্যের রহস্য চাদরে ঢাকা রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আঁধার মানিক। যা স্থানীয়ভাবে কানা রাজার সুড়ঙ্গ হিসেবে পরিচিত। এই কানা রাজার সুড়ঙ্গকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। হাজার বছরের পুরনো এ সুড়ঙ্গ সংস্কার হলে হয়ে উঠবে দেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। কক্সবাজার পর্যটন শিল্প বিকাশে উন্নয়নের মেগা প্রকল্পে কানা রাজার গুহা সংস্কার প্রকল্প হাতে নেয়া হলে অপার সম্ভাবনাময় এ স্থানটি হয়ে উঠবে পর্যটকদের অতি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এই গুহাকে আঁধার মানিক হিসেবেও অনেকে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক সূত্রমতে এটিকে রাজা চিন পিয়ান বা কিংবেরিং এর উদ্বাস্তু জীবনের শেষ সময়কালের আশ্রয়স্থল বা দুর্গ বলে ধারণা করা হয়।

কথিত আছে, বর্মী সেনা ও বর্মী অনুগত আরাকানিদের উপর অত্যাচার করার কারণে প্রতিপক্ষের সংঘবদ্ধ আক্রমণে পরাজিত হয়ে চিন পিয়ান বৃহত্তর চট্টগ্রামে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেন। তাকে ধরিয়ে দিতে করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৎকালীন ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। এ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য চিন পিয়ান পুনরায় আরাকানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানেও বর্মীদের পাল্টা প্রতিরোধের কারণে তিনি রামুর পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় নেন। এখানে থাকাকালীন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাহাড়ের গভীরে খনন করা হয় এই গোপন সুড়ঙ্গ বা দুর্গ।

ছবি-৪৪: কানা রাজার সুড়ংগ, রামু, কক্সবাজার

১৯ শতকের গোড়ার দিকে এই গুহা আবিস্কার করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত কক্সবাজারের ইতিহাস গ্রন্থে এই সুড়ঙ্গ বা আঁধার মানিক সম্পর্কে বিশদ তথ্য রয়েছে। এটির দৈর্ঘ্য আনুমানিক পাঁচ কিলোমিটার বলে জানা গেছে। পাহাড়ের উপর দিকে দুটি নিচের দিকে চলে গেছে দুটি সুরঙ্গ। পাহাড় ধ্বংসের কারণে গুহার একটি মুখ আংশিক বন্ধ হয়ে আছে।[৬]

সমস্যা সমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঙ) কোন গবেষণা নাই

৩। চকোরিয়াঃ

৩.৩.১। ডুলাহাজরা সাফারী পার্ক

ডুলাহাজারা সাফারি পার্কটি কক্সবাজার জেলা সদর থেকে ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে এবং চকরিয়া থানা থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে,কক্সবাজার জেলা সদরের দক্ষিণ বন বিভাগের ফাসিয়াখালি রেঞ্জের ডুলাহাজারা ব্লকে অবস্থিত। মূলত হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাফারি পার্কটি ৬০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত।ডুলাহাজারা সাফারি পার্ককে কেউ কেউ সাফারি পার্ক বলতে রাজি নন, কারণ এখানে প্রাকৃতিক অবকাঠামোর বদলে অত্যাধুনিক ও কৃত্রিম অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে বেশি।[২]বাংলাদেশ বন বিভাগের দেয়া তথ্যমতে, এই পার্কটিতে বছরে প্রায় ১,০০,০০০ পর্যটক ভ্রমণ আসেন, এবং পার্কের প্রবেশ মূল্য ৳৫০ (পঞ্চাশ টাকা)।

ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক মূলত হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে বাঘ, সিংহ, হাতি, ভালুক, গয়াল, কুমির, জলহস্তী, মায়া হরিণ, সম্বর হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ প্রভৃতি প্রাণীও রয়েছে।[১] এই পার্কে স্বাদুপানির কুমির যেমন আছে, তেমনি আছে লোনা পানির কুমির। এছাড়াও ২০১৭ থেকে এ পার্কে তৈরী করা হয়েছে কৃত্রিম আফ্রিকান সাফারি যেখানে আফ্রিকান প্রাণী হিসেবে রয়েছে জেব্রা ও ওয়াইল্ড বিস্ট[৫]।

ছবি-৪৫-৪৬: ডুলাহাজরা সাফারী পার্ক,চকোরিয়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) পার্ক হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই

৩.৩.২। বীর কমলার দিঘী

কমলা দেবী ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা ধন্য মানিক্যের স্ত্রী। ধন্য মানিক্য ১৪৬৩-১৫১৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা ছিলেন। কমলা দেবীর নামে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের বীর কমলার দিঘির নামকরণ হয়। ছয় একর জায়গাজুড়ে এই দিঘি দূরদূরান্ত থেকে দেখতে আসেন দর্শনার্থীরা। তাঁরা নৌকা নিয়ে দিঘিটি ঘুরে দেখেন। ইতিহাসবিদদের ভাষ্যমতে, ১৫০১ সালে ইলিয়াছ শাহ আরাকান রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সুযোগে ১৫১৩ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ধন্য মানিক্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দখলের জন্য আক্রমণ করেন। তিনি কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড় পার হয়ে চকরিয়ার মানিকপুর পর্যন্ত দখল করে 'চাটিগ্রাম বিজয়ী' উপাধিসংবলিত মুদ্রা জারি করেন। ওই সময় ধন্য মানিক্য ও তাঁর সৈন্য বাহিনী চকরিয়ার কাকারা এলাকায় বিজয়ের ও উন্নয়নের নিদর্শন হিসেবে একটি দিঘি খনন করেন। যে দিঘির নামকরণ করা হয় কমলা দেবীর নামে। বর্তমানে দিঘিটি 'বীর কমলার দিঘি' নামে পরিচিত।

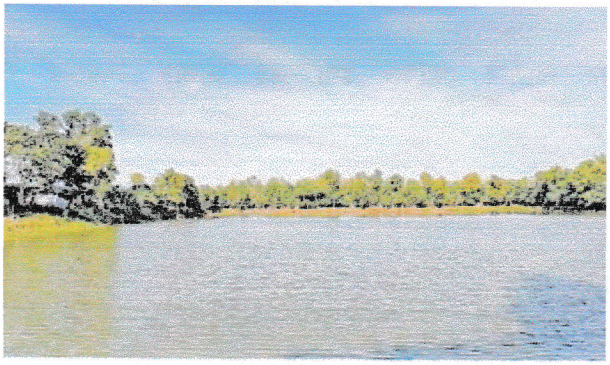

ছবি-৪৭: বীর কমলার দিঘী, কক্সবাজার

১৯৪৬-৪৭ সালে চকরিয়ার বাসিন্দা আবু খায়ের ও হাবিবুর রহমান বীর কমলার দিঘিটি সরকারের কাছ থেকে নিলাম খরিদ করেন। পরবর্তী সময়ে দিঘির একক মালিক হন আবুল খায়েরের ছেলে চকরিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আবু মোহাম্মদ বশিরুল আলম। ২০১০ সালে তিনি দিঘিটি সংস্কার করে মাছ চাষ শুরু করেন। এই দিঘির পাড়ে শতবর্ষী কয়েকটি তেঁতুলগাছ রয়েছে। চকরিয়া পৌর শহর থেকে অটোরিকশা নিয়ে জিদ্দা বাজার হয়ে সহজেই এই দিঘি দেখতে যাওয়া যায়[৮]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই

৩.৩.৩। ফজল কিউকের মসজিদ

জেলার এক অনন্য স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ শতাব্দী প্রাচীন মানিকপুর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ফজল কিউকের মসজিদ। চকরিয়া উপজেলার মানিকপুর-সুরাজপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ মানিকপুর ইউনিয়নে অবস্থিত এই প্রাচীন মসজিদটি। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মানিকপুর গ্রামটি ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্যের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। ''১৫৮৪সালে ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্যের ছেলে রাজপুত্র রাজদাহার নারায়ণের নেতৃত্বে আরাকান রাজার অধীনস্থ বর্তমান মানিকপুরসহ পাহাড়ি এলাকা দখল করে নেন। এর পরেই অদূরেই খনন করে বিশাল দিঘি, যাকে স্থানীয় লোকজন 'কমলার দিঘি' নামেই জানে। আর এই কমলার দিঘি রাজা ধঘন্য মানিক্যের স্ত্রী বীর কমলার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজা ধন্যমানিক্যের নামের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে অবস্থান করা মানিকপুর গ্রামে মুসলমান বসতি শুরু হওয়ার পরে নির্মিত হয় এই সুদৃশ্য নয়নাভিরারম স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন 'মানিকপুর' মসজিদ। পরবর্তীতে মসজিদটি 'ফজল কিউকের মসজি' নামেই অভিহিত হয়। প্রাচীনকালে মানিকপুর গ্রামটি উপজাতীয় চাক ও চাকমা সম্প্রদায়ের লোকজন অধ্যুষিত এলাকা ছিল। পরে এলাকায় মুসলমানদের আগমন এবং বসতি গড়ে ওঠে। ফজলুল করিম সিকদার তথা ফজল কিউক-এর পূর্ব ফজলুল করিম সিকদা 'ফজল কিউক' নামেই পরিচিত হয়ে পড়েন।'কিউক' বাংলা না চাক ভাষা এলাকাবাসী বলতে পারেন না। তবে তাদের ধারণ তা চাক ভাষা। চাক সম্প্রদায়ের লোকজন স্থানীয় জমিদার ফজলুল করিম সিকদারকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এরপর থেকেই তিনি 'পঝল কিউক' নামেই পরিচিত হয়ে যান। ১৯০৮ সালে স্থানীয় জমিদার ও আধ্যাত্মিক সাধক-পুরষ ফজলুল করিম সিকদার প্রকাশ ফজল কিউক মোগল সম্রাটদের স্থাপত্য অনুসরণ করে তিনটি গম্ভুজ ও বরোটি সৃদৃশ্য পিলার সম্বলিত এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের দেয়াল প্রায় তিন ফুট চওড়া। ইটের শুরকির সাথে চুনা মিশিয়ে মসজিদের দেয়াল এবং ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে তার কবরও রয়েছে[১০]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঙ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই

৩.৩.৪। মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান

মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত একটি জাতীয় উদ্যান। এই বনটি তার সুবিশাল মাদার গর্জন গাছের জন্য সুপরিচিত। মেধা কচ্ছপিয়া একটি প্রাকৃতিক বন। ২০০৪সালে উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষিত হয়। এই জাতীয় উদ্যানের আয়তন প্রায় ৩৯৫.৯২ হেক্টর।

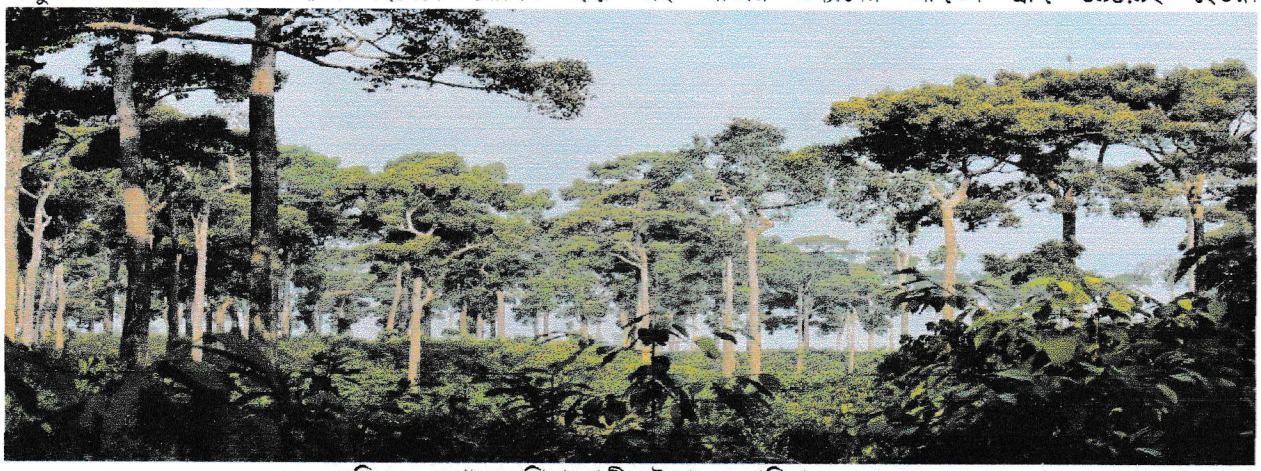

ছবি-৪৮: মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান,চকোরিয়া, কক্সবাজার

এখানকার বনের প্রকৃতি হলো ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বন। এ উদ্যানটি কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। পার্কটির ১ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে আনুমানিক ১৮৩০৫ জন লোকের ৩৫২৩টি পরিবার বসবাস করে। এসব স্থানীয় গ্রাম কিংবা পাড়া গুলো মূলতঃ কৃষিকাজ, লবণ চাষ ও মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। রোহিঙ্গা শরনার্থীদের কারণে এ সকল জনগোষ্টিতে ক্রমান্বয়ে জন সংখ্যার চাপ বাড়ছে।এখানে জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হল শতবর্ষী গর্জন বনকে রক্ষা করা। এই উপমহাদেশে যে অল্প কিছু গর্জন বন আজও মাথা উঁচু করে আছে। এ বনটি তার মধ্যে অন্যতম। এই জাতীয় উদ্যানের প্রধান বৃক্ষরাজির মধ্যে বিশালাকৃতির গর্জন ছাড়াও রয়েছে ঢাকিজাম, ভাদি, তেলসুর ও চাপালিশ[৫]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) স্থাপনা হিসেবে কোন প্রচারণা নাই
ঘ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঙ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই

৩.৩,৫ ফাসিয়াখালী জাতীয় উদ্যানঃ

ছবি-৪৯: ফাসিয়াখালী জাতীয় উদ্যান, চকোরিয়া, কক্সবাজার

ফাসিয়াখালি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ২০০৭ সালের ১১ এপ্রিল এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩০২.৪৩ হেক্টর জমি নিয়ে এই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি গঠিত। ফাসিয়াখালি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যে সাময়িকভাবে বিচরণকারী এশীয় হাতির দেখা পাওয়া যায়[৫]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই

৩.৪। মহেশখালীঃ

৩.৪.১। আদিনাথ মন্দির(মহেশখালী)

আদিনাথ মন্দির বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। এটি কক্সবাজার থেকে ১২ কিমি দূরের দ্বীপ মহেশখালীতে অবস্থিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মন্দিরটি শিব মন্দিরও নামেও বহুল প্রচলিত।কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার গোরকঘাটা ইউনিয়নের ঠাকুরতলা গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থিত, যা সমুদ্র-সমতল থেকে প্রায় ৮৫.৩ মিটার উঁচুতে। এই মন্দিরটি মৈনাক পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত, যা সমতল থেকে ৬৯টি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। আদিনাথের অপর নাম মহেশ। এই মহেশের নামানুসারে মহেশখালী।আদিনাথ মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮৮ ফুট উপরে মৈনাকে পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত। মহেশখালি চ্যানেল সংলগ্ন চ্যানেলের পশ্চিম পাশে পাহাড়টির অবস্থান। পূর্বে আদিনাথ মন্দির সংলগ্ন ও এর অধীনস্থ জমির পরিমাণ ছিল ২১৭ একর। মন্দিরের পূর্ব পাশের অনেক জমি মহেশখালি চ্যানেল ইতোমধ্যে গ্রাস করে ফেলেছে। আদিনাথ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১০.৮৭ মিটার, প্রস্থ ৮.৬২ মিটার এবং উচ্চতা ৫.৯৩ মিটার। কথিত আছে, মূল মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশে প্রথম ভাগে ৩.৩৫ মিটার বর্গকৃতির দুটো পূজাক্ষ। পূর্ব কক্ষে রয়েছে বাণলিঙ্গ শিবমূর্তি এবং পশ্চিম কক্ষে রয়েছে অষ্টভুজা এক দুর্গামূর্তি। মন্দিরে রক্ষিত অষ্টভূজা দূর্গামূর্তি ১৮১৭ সালে সুদূর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুর রাজকীয় মন্দির থেকে এনে আদিনাথ প্রতিস্থাপিত হয়। পুকুরসহ আদিনাথ মন্দির এলাকার জমির পরিমাণ ৫.০৭ একর। আদিনাথ মন্দির বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির। হিন্দুদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বসে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা। আদিনাথ মন্দির বর্তমানে শুধু পূজা নয়, পিকনিক স্পট হিসেবেও বিবেচিত হয়ে আসছে। দেশি বিদেশি হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে মেলা ও পূজা প্রাঙ্গণ হয় মুখরিত। তাছাড়া প্রতিনিয়ত বিশেষ করে শীত মওসুমে অসংখ্য পর্যটকের পদভারে ছন্দময় হয়ে ওঠে মন্দির এলাকা ৫]।

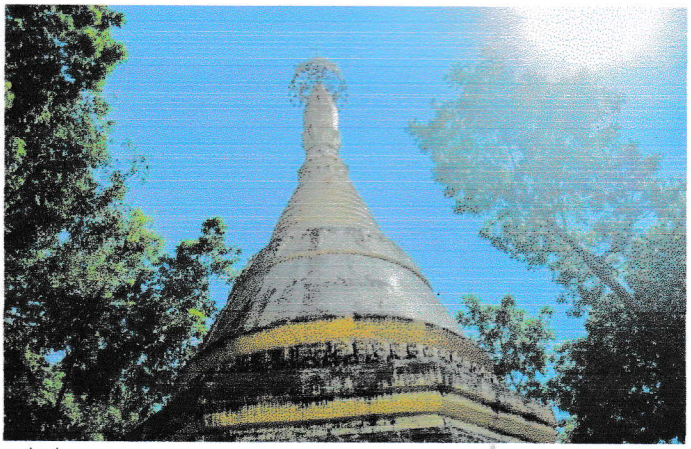

ছবি-৫০-৫১: আদিনাথ মন্দির ও প্যাগোডা, মহেশখালী, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৪.২। সোনাদ্বীয়া দ্বীপ

সোনাদিয়া কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী উপজেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটিদ্বীপ । দ্বীপটির আয়তন ৭ বর্গ কিলোমিটার। কক্সবাজার জেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নে সোনাদিয়া অবস্থিত। প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রশস্থ সৈকত, সৈকত ঘেষে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে থাকা সুউচ্চ বালিয়াড়ি, জালের মতো ছোট-বড় অসংখ্য খাল বেষ্টিত ম্যানগ্রোভ বন, বিস্তির্ণ ল্যাগুন্যাল ম্যাডফ্ল্যাট, কেয়া-নিশিন্দার ঝোপ, বিচিত্র প্রজাতির জলচর পাখি সোনাদিয়া দ্বীপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমুদ্র সৈকতের পাশ ঘেষে অবস্থিত সোনাদিয়ার সু-উচ্চু বালিয়াড়ির তুলনা বাংলাদেশে নেই। সমুদ্র এবং সৈকত থেকে বালিয়াড়ির দৃশ্য অপূর্ব মনে হয়। সোনাদিয়ার সৈকত এবং বালিয়াড়ি বিপন্ন জলপাই বর্ণের সামুদ্রিক কাছিমের ডিম পাড়ার উপযোগী স্থান। এখানে সামুদ্রিক সবুজ কাছিমও ডিম পাড়তে আসে। সমুদ্র সৈকতের বেলাভূমিতে পানির কিনারা ঘেষে বিচরন করে লাল কাঁকড়া এবং প্যারাবন এলাকায় শীলা কাঁকড়া পাওয়া যায়।

দ্বীপের মানুষেরা মূলত দুইটি গ্রামে বসবাস করে: সোনাদিয়া পূর্বপাড়া এবং সোনাদিয়া পশ্চিমপাড়া। দ্বীপটির বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় এক হাজার সাত শত। বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্ব উপকূলীয় প্যারাবনের অবশিষ্টাংশ এখন মূলত শুধু সোনাদিয়া দ্বীপেই দেখা যায়। সোনাদিয়ার প্যারাবন বাইন বৃক্ষ সমৃদ্ধ। এছাড়া প্যারাবনে কেওড়া, গেওয়া, হারগোজা, নুনিয়া ইত্যাদি ম্যনগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। প্যারাবনের ভিতরে সুন্দর বনের মত ছোট ছোট নদীর দু'পাশে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায়। সোনাদিয়ার প্যারাবন, চর, খাল ও মোহনা নানা প্রজাতির মাছ ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর গুরুত্বপূর্ন আবাসস্থল। দ্বীপটির প্যারাবন সংলগ্ন খালে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় যেমন-বাটা, কোরাল, তাইল্যা, দাতিনা, কাউন, পোয়া ইত্যাদি।

সোনাদিয়া দ্বীপকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৪ নং ধারার বিধান অনুসারে ১৯৯৯ সালে সোনাদিয়া দ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী ঘটিভাংগা মৌজার আংশিক এলাকা নিয়ে ইকোলজিকেলি ক্রিটিক্যাল এরিয়া বা ইসিএ ঘোষনা করে[৫]।

ছবি-৫২: সোনাদ্বীয়া দ্বীপ, মহেশখালী, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
ঙ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৪.৩। বড় রাখাইন পাড়া বৌদ্ধ মন্দির

মহেশখালীতে অনেক দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম শতাব্দীর পুরানো ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দির। রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মন্দির দেখার জন্য মহেশখালীতে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের সমাগম ঘটে।মূল মন্দির আনুমানিক প্রায় ২৮৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। বড় পিতলের মুর্তিটি ১০১ বৎসর পূর্বে এটি বাংলাদেশের মধ্যে ২য় বৃহত্তম বৌদ্ধমুর্তি, দায়ক স্বর্গীয় উ থৈংঅংক্য এবং দায়িকা স্বর্গীয় দো নেং ওয়ে স্থাপন করেন। সীমা মন্দিরের দাড়ানো মুর্তি সম্পূর্ণ একটি গাছকে খোদাই করে বানানো, বিরল এই মুর্তিটি আনুমানিক প্রায় ১১২ বৎসর পূর্বে স্থাপন করা হয়। গাছের খোদাই করা আর কোন বৌদ্ধমুর্তি বাংলাদেশে নেই।এ মন্দিরের দায়ক স্বর্গীয় কো হলা রি দায়িকা স্বর্গীয় দো নিংমা। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে ন্যাশনাল পিছ প্যাগোডা, কো না ওয়াং প্যাকোডা (রাশি চক্রের প্যাকোডা)। মুং জা লিংদা ধর্মীয় পুকুর-গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধত্ব লাভের পর ০৭ টি পূণ্য স্থানে ০৭ দিন করে ধ্যানেরত ছিলেন। তিনি ৬ষ্ঠ সপ্তাহ অতিবাহিতকালে এই মুং জা লিংদা পুকুরে ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়। এই সময় গৌতম বুদ্ধের দেহটিকে ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য নাগরাজ নিজ দেহকে আশ্রম তৈরী করে গৌতম বুদ্ধের মস্তকের উপর ফণা আকৃতি করে এক সপ্তাহ ব্যাপি অবস্থান করেছিলেন। এ থেকে গৌতম বুদ্ধের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি বছর রাখাইনরা মুং জা লিংদা পুকুরে বর্ষাব্রত পালন করে থাকেন।

২০১১ সালের আদম শুমারীর হিসাব অনুযায়ী মহেশখালীতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৭৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত) জন এবং ৫টি বৌদ্ধ মন্দির। রাখাইন আবাসিক এলাকা গুলোতে গৌতমবুদ্ধের জন্ম দিন, নির্বাণ লাভের দিন ও সমাধির দিন। তাদের আর একটি বড় উৎসব হলো ফানুস বাতি উড্ডয়নের দিন, পুজার সময় তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে অতিথি আপ্যায়ন হয়। রাখাইনদের আর একটি উৎসব রাখাইন ভাষায় সাংগ্রাই বা নববর্ষের উৎসব। এই সাংগ্রাই উৎসব (এপ্রিল মাসের ১৩-১৪) জলকেলি অনুষ্ঠিত হয়। জলকেলি অনুষ্ঠানটি তাদের অন্যরকম খেলা। ১৪ হতে ২০ বছরের তরুণ-তরুণী নিজেদের মধ্যে জল নিক্ষেপের মাধ্যমে হৃদয় বিনিময় হয়। তরুণীরা ও বিভিন্ন রকমের ফুলের লাল থামি আঁল্লনা আঁকা ফতুয়া পরিধান করে হাতে পানির পাত্র নিয়ে ছেলেদের পানি নিক্ষেপ করে। এই তিন দিনের অনুষ্ঠানে উভয় লিঙ্গের মধ্যে অন্য রকম ভাবের সৃষ্টি হয়। তাদের বৈচিত্র্যময় ও মধুময় গান যেমন- তেয়াংশে (লোকগীতি)। এছাড়াও অসংখ্য সংগীত রয়েছে [৫]।

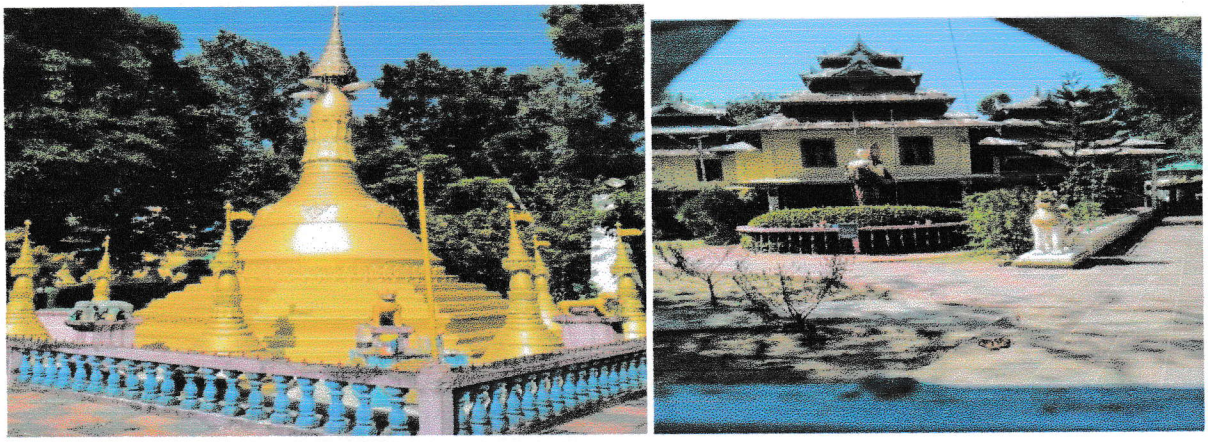

ছবি-৫৩-৫৪: বড় রাখাইন পাড়া বৌদ্ধ মন্দির, মহেশখালী, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৪.৪। আদীনাথ মন্দির জেটি ঘাট

দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীর মূল প্রবেশদ্বার ০২ (দুই) জেটি; ০১ গোরকঘাটা জেটি, ০২ আদিনাথ জেটি। গোরকঘাটা জেটিটি ১৯৮৬সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত হয়। মূলত এই জেটিটি নির্মানের পর হতে জেলা শহর কক্সবাজারের সাথে যোগাযোগ অনেক সহজতর হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোরকঘাটা জেটি উদ্বোধন করেন। উভয় জেটি দিয়ে দেশী-বিদেশী পর্যটকগণ মহেশখালী তথা মহেশখালীর বিশ্বখ্যাত আদিনাথ মন্দির দেখতে আসে। এই ০২ টি জেটি দিয়ে স্পীডবোট এবং ইঞ্জিন বোটের মাধ্যমে মহেশখালীবাসী জেলা শহর কক্সবাজারে যাতায়াত করে। আদিনাথ জেটি ২০০৬ সালে নির্মাণ হয়। মহেশখালীর অন্যতম আকর্ষণ আদিনাথ জেটি। এটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম জেটি। আদিনাথ মন্দিরের পাদদেশ হতে শুরু হয়ে মহেশখালী চ্যানেলে গিয়ে পড়েছে এই সুদীর্ঘ জেটি। পিছনে শ্যামল মৈনাক পাহাড়, অন্যদিকে নোনাজলের সমুদ্র, দুপাশে ঘন নিবিড় প্যারাবন জেটিটিকে এক অপূর্ব নৈসর্গিক মহিমায় উদ্ভাসিত করেছে। সোলার লাইটের মিষ্টি আলোয় জেটিটির সৌন্দর্য্য রাতের বেলায় পর্যটক মনকে আকৃষ্ট করে [৫]।

ছবি-৫৫: আদীনাথ মন্দির জেটি ঘাট, মহেশখালী, কক্সবাজার

সমস্যা সমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৫। উখিয়া উপজেলাঃ

৩.৫.১। ইনানী বিচ

হিমছড়ি থেকে আরো ০৫ কিলোমিটার গেলেই ইনানী বীচ বা ইনানী সমুদ্র সৈকত। ইনানী বীচে প্রবাল পাথরের ছড়াছড়ি। অনেকটা সেন্টমার্টিনের মতই। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের মত এখানে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে না সৈকতের বেলাভূমিতে। অনেকটাই শান্ত প্রকৃতির সৈকত এই ইনানী। জোয়ারের সময় এলে প্রবাল পাথরের দেখা পাওয়া যাবে না। ভাটার সময়েই কেবল মাত্র বিশাল এলাকা জুড়ে ভেসে উঠে এই পাথর। প্রবাল পাথরে লেগে থাকে ধারালো শামুক-ঝিনুক।, ইনানী সমুদ্র সৈকত যা কক্সবাজার থেকে ৩৫ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত। অভাবনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর এই সমুদ্র সৈকতটি কক্সবাজার থেকে রাস্তায় মাত্র আধঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। পরিষ্কার পানির জন্য জায়গাটি পর্যটকদের কাছে সমুদ্রস্নানের জন্য উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিতসবচেয়ে আকর্ষণীয় ইনানী সৈকত[৫]।

ছবি-৫৬-৫৭: ইনানী পাথুরে বীচ উখিয়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা অপ্রতুল

৩.৫.২। পাটুয়ারটেক পাথুরে বীচ

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ও সেরা পর্যটন নগরী কক্সবাজার। কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের মাঝপথে উখিয়ার ইনানী সমুদ্র সৈকত। একটু যেতেই পাটুয়ারটেক। মেরিন ড্রাইভ সড়কের একপাশে পাথুরে গাথা বিশাল সমুদ্র আর অন্য পাশে বলয়জুড়ে পাহাড়ের বিস্তৃতি। পাটুয়ারটেক সমুদ্র সৈকত আর রাতে সেখানকার বালিতে আছড়ে পড়া ঢেউ দেখলে মনে হবে যেন ছড়িয়ে আছে অসংখ্য রত্ন। বর্ষায় পাহাড় অরণ্যের এ রুপ সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় থাকে। বাতাসে অধিক পরিমাণে জলীয়বাস্প জমলে, তার সাথে ব্যাকটেরিয়ার বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় উজ্জল আলোর। প্রকৃতিতে রাতে নির্জন সৈকত ও গভীর অরণ্যে এনে দেয় আলো ঝলমলে উজ্জলতা। বিশাল আকাশের নিচে এক অপরুপ লীলাভূমি উখিয়ার পাটুয়ারটেক পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সব চাইতে বেশি ভালো লাগবে লাল কাঁকড়া। সাগরের বিভিন্ন জাতের কাকঁড়া ভেজা মাটিতে ছোট ছোট গর্তে মুখ তুলে থাকে, হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় এসব গর্তে থাকা কাঁকড়াগুলো [৫]।

ছবি-৫৮: পাটুয়ার টেক পাথুরে বীচ, উখিয়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৬ কুতুবদিয়াঃ

কুতুবদিয়া বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এটি একটি দ্বীপ, যা কুতুবদিয়া চ্যানেল দ্বারা মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। কুতুবদিয়া উপজেলার দর্শনীয় স্থান নিম্নরুপঃ

৩.৬.১। কুতুবদিয়া বাতিঘর:

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে চট্টগ্রাম নৌবন্দর গড়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে দুটি অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হয়েছিল। এরও বহ আগে থেকে চট্টগ্রামে জাহাজ চলাচল করতো। এই কারণে ব্রিটিশদের চট্টগ্রাম নৌবন্দর উন্নয়নের বেশ আগে থেকে কুতুবদিয়ায় বাতি ঘর তৈরি করা হয়েছিল।১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণফুলি নদীর মোহনার ৪০ মাইল দূরে কুতুবদিয়াতে এই বাতিঘরটি নির্মাণ করা হয়। ক্যাপ্টেন হেয়ার-এর পরিচালনায় এবং ইঞ্জিনিয়র জে,এইচ,টুগুড -এর নকশায় এই বাতিঘর নির্মাণ করা হয়। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এই বাতিঘরটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সেই সময়ে এর নির্মাণ ব্যয় ছিল ৪৪২৮ টাকা।এই বাতিঘরের ভিত্তিভূমিতে পাথর স্থাপন করা হয় এবং ভিত্তির উপর গড়ে তোলা হয় ১২০ ফুট উচ্চতার টাওয়ার। টাওয়ারটির মাটির নিচে একটি কক্ষ ছিল। ভূপৃষ্ঠ থেকে টাওয়ারে অংশে ছিল ১৫ফুট উচ্চতার ১৫টি কক্ষ। সে সময় প্রায় ২২০ কিলোমিটার দূর থেকে এর আলো রাতের জাহাজ-নাবিকরা দেখতে পারতো। পাকিস্তান আমলে এই টাওয়ারটি নতুন করে নির্মাণ করা লৌহ কাঠামোর উপর। এই টাওয়ারের প্রাচীন আলোক-উৎপাদন প্রক্রিয়া বাতিল করে আধুনিক পদ্ধতি চালু করা হয়। পরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পাকিস্তান আমলেই এই বাতিঘরটি অকেজো হয়ে পড়েছিল। পরে ক্রমাগত সমুদ্রের ভাঙ্গনের মুখে এই বাতিঘরটি বিলীন হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কুতুবদিয়ার দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নে একটি নতুন বাতিঘর নির্মিত হয়েছে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে। এই বাতিঘরটি তৈরি করা হয়েছে ইস্পাতের কৌণিক দন্ড ব্যবহার করে। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ে একমাত্র ওয়্যারলেস যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে ডিজেল চালিত জেনারেটরের মাধ্যমে ১৫টি ব্যাটারিতে চার্জ করা হয়। এবং ওই ব্যাটারির মাধ্যমে বাতিঘরে আলো জ্বালনো হয় [৫]।

ছবি-৫৯: কুতুবদিয়া বাতিঘর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৬.২ বায়ু বিদ্যুতঃ

দেশের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ কক্সবাজারের কুতুবদিয়া। এই দ্বীপে প্রায় ২ লাখ মানুষের বসবাস। যেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা বলতে ডিজেল চালিত জেনারেটর এবং সৌর বিদ্যুৎই একমাত্র ভরসা। এ কারণে দ্বীপবাসীর দু:খ লাঘবের কথা বিবেচনা করে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ফ্যান এশিয়া পাওয়ার সার্ভিসেস লিমিটেডের মাধ্যমে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেয় সরকার।কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের তাবলারচর গ্রামের বেড়িবাঁধের পাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি টারবাইন (বায়ুকল) দিয়ে প্রথমে ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রকল্প স্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি আলোর মুখ দেখার আগেই ২০১০ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গত ২০১৬ সালে ২৩ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন আঙ্গিকে ২০টি টারবাইন দিয়ে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। এতে আরও এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হয়ে বর্তমানে ২ মেগাওয়াটে পরিণত হয়। এখন সাড়ে ৭শ'পরিবারে জ্বলছে এই বায়ু বিদ্যুৎ। আর এই বিদুৎ পেয়ে আনন্দিত কুতুবদিয়া উপজেলার মানুষ[৫]।

ছবি-৬০: বায়ু বিদ্যুত, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৬.৩ কুতুবদিয়া সমুদ্র সৈকতঃ

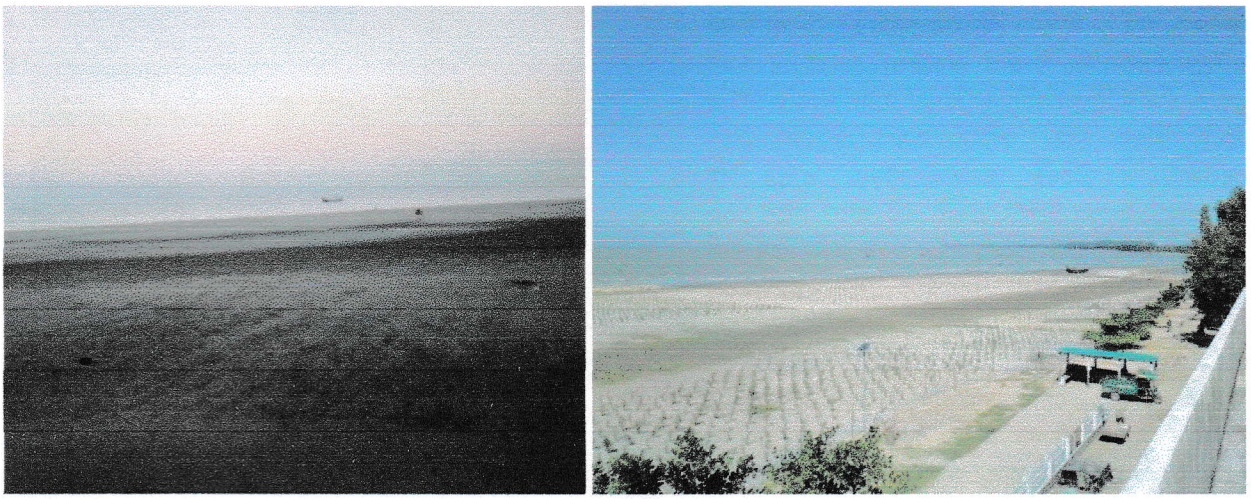

ছবি-৬১-৬২: সমুদ্রসৈকত, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৭ টেকনাফঃ

৩.৭.১। সেন্টমার্টিন দ্বীপ

সেন্টমার্টিন দ্বীপকে সেখানকার লোকেরা বলে নারকেল জিনজিরা । ব্রিটিশরা যখন এ এলাকা শাসন করত তখন মি. মার্টিন নামে এক ধর্মযাজক এখানে আসেন। তার নাম অনুসারে দ্বীপের নাম হয় সেন্টমার্টিন দ্বীপ। দ্বীপটি দূর থেকে দেখতে অনেকটা গোলাকার দ্বীপের মতো মনে হয়। আসলে দ্বীপটি লম্বা। এই দ্বীপ চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রধান দ্বীপটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। এর আয়তন সবচেয়ে বড়। অন্য তিনটি অংশ প্রধান দ্বীপের সাথে মালার মতো লেগে আছে। জোয়ারের সময় চারটি অংশ দ্বীপের মতো দেখা যায়। আবার ভাটার সব অংশ একটি দ্বীপের মতো হয়ে যায়। প্রধান দ্বীপের অংশে রয়েছে নারকেল বাগান। এ জন্য এই অংশকে নারকেল জিনজিরা বলা হয়। এখানে রয়েছে ক্ষেত খামার। শাক সবজি চাষ হয় এখানে। ভূমিতে রয়েছে শামুক জিনুকের গুড়া বালি ও সিলিকা বালি। আছে মিঠা পানির ছোট পুকুর। বাড়িঘর, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, পোস্ট অফিস ইত্যাদিও রয়েছে এই দ্বীপে। এই দ্বীপের বেশিল ভাগ মানুষ জিনজিরাতে বাস করে। জিনজিরার দক্ষিণ অংশ ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকের এই সরু অংশের নাম গলাচিপা। গলাচিপার দক্ষিণ অংশের নাম দক্ষিণ পাড়া। এখানে ও কৃষি কাজ হয়। ধান চাষ হয়। গলাচিপা থেকে দক্ষিণ পাড়া শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রয়েছে প্রবাল পাথর, দুই একটি ডোবা ইত্যাদি। আর আছে শামুক চূর্ণের প্রাচীর , নোনা বন এবং জলাভূমি। দক্ষিণ পাড়ার পর ছেড়াদিয়া। ছেড়াদিয়ায় রয়েছে ছোট ছোট দুটি দ্বীপ। এখানে রয়েছে ঘোনঝোপ আর কাটাবন। ছেড়াদিয়ায় বসতি নেই। নেই কৃষি জমি। কিন্তু ছেড়াদিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের ভরপুর। (পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়,২০০৪)

সেন্টমার্টিন দ্বীপের অবস্থান বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে। এই দ্বীপ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা থেকে ৩৪ কিলোমিটার দক্ষিণে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ভূখন্ড বদর মোকাম থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে সেন্টমার্টিন'স দ্বীপ অবস্থিত। জোয়ারের সময় সেন্টমার্টিন'স দ্বীপের নিচু অংশ ডুবে যায়। আবার ভাটার সময় জেগে উঠে। ভাটার সময় ছেড়াদিয়া সহ সেন্টমার্টিন'স দ্বীপের আয়তন দাঁড়ায় ৩.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। মূল দ্বীপটি ছাড়াও এর আশে পাশে ১০০ থেকে ৫০০ বর্গ মিটার আয়তনের খুবই ছোট কিছু দ্বীপ আছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলে ছেড়াদিয়া। ছেড়াদিয়া শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

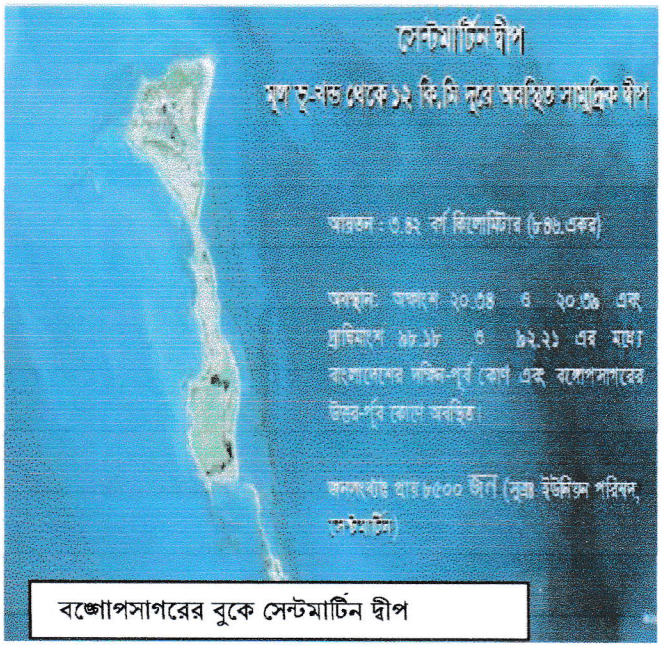

বঙ্গোপসাগরের বুকে সেন্টমার্টিন দ্বীপ

দ্বীপে জনবসতি স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয় শুরু হয়েছে। মানুষ বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি করেছে। ঘর নির্মাণের জন্যে গাছ কেটেছে। ঘরের ছাউটিনর জন্যে শন, ঘাস, লতাপাতা সংগ্রহ করেছে। কৃষি কাজের জন্যে বনজঙ্গল পরিষ্কার করেছে। এভাবে দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। শুরু হয়েছে দ্বীপের ক্ষয়। দ্বীপে প্রাকৃতিক ভাবে যে সব ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম জন্মাত তা ব্যাহত হচ্ছে। এসব কারণে ভূমি ক্ষয় হচ্ছে। দ্বীপ প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

এক সময় এই দ্বীপে প্রচুর প্রবাল জন্মাত। দক্ষিণ পাড়ার পূর্ব উপকূলে জন্মানো এক একটি প্রবালের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট, প্রস্থ ছিল ৮ থেকে ১০ ফুট, উচ্চতা ৭ থেকে ৮ ফুট। পরবর্তীতে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকগুলো প্রবাল ভেঙে গেছে। প্রবালের সংখ্যাও কমে গেছে । দ্বীপবাসীদের অনেকে শামুক, ঝিনুক, মাছের করাত, সাগর আরচিন, বিভিন্ন প্রাণীর খোলস সংগ্রহ করে বিক্রি করে। শীল-নোড়া তৈরি জন্য বেলিপাথর সংগ্রহ এবং চুন তৈরির জন্যে প্রবাল ধ্বংস করা হচ্ছে। শিক্ষা সফরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক জীব সংগ্রহ করে থাকে। এসব কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। দ্বীপের চারদিকে সাগরে মাছ ধরা বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলার চলাচল। এগুলো থেকে নির্গত তেল, ময়লা আবর্জনা পরিবেশ নষ্ট করছে। বিষ্ফোরক দ্রব্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে মাছ ধরার কারণে দূষণ ঘটেছে। [৯]

সমস্যাসমূহঃ

ক) চতুর্দিকে দ্বীপের ভাঙনঃ
ক) সঠিক বর্জ্য ববস্থাপনার অভাব
খ) বিদ্যুত সুবিধা নাই
গ) শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার অভাব
ঘ) চিকিৎসা সেবার অভাব
ঙ) অনুন্নত সড়ক যোগাযোগ
চ) পর্যটন মৌসুম ব্যতীত টেকনাফের সাথে যাতায়াতের সমস্যা
ছ) বাচ্চাদের খেলার মাঠের অভাব
জ) জ্বালানী সমস্যা
ঝ) স্লুইসগেট না থাকা এবং লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ
ঞ) বহিরাগত মানুষ কর্তৃক দ্বীপের জমি ক্রয়
ট) জেটি ঘাট ভঙ্গুর ও সংস্কারবিহীন

৩.৭.২। মাথিনের কুপ

উপন্যাসিক ধীরাজ ভট্টাচার্য উনবিংশশতাব্দীর প্রথমদিকে এস.আই .হিসাবে টেকনাফ থানায় বদলী হয়ে এসেছিলেন। তখনটেকনাফের নাম করা রাখাইন জমিদার ওয়াংথিনের একমাত্র আদুরে কন্য মাথিন থানারসামনের কুয়া থেকে নিয়মিত পানি নিতে আসতো। সকাল বিকাল পানি নিতে আসা ছিলমাথিনের সখ। পুলিশ কর্মকর্তা প্রতিদিন থানার বারান্দায় বসে বসে অপূর্বসুন্দরী

মাথিনের পানি নিতে আসা যাওয়া দেখতেন। আস্তেআস্তে ধীরাজভট্টাচার্যের সংগে মাথিনের চোখা চোখি এবং পরে তা' প্রেমে পরিণত হয়।বিয়ে করতে ব্যর্থ হলে, মাথিন বিচ্ছেদের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকরে। মাথিনের অতৃপ্ত প্রেমের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী মাথিনের কুপ। টেকনাফথানা প্রাঙ্গনে একুপের অবস্থান। এখন কূপটি দেখতে খুবই আকর্ষনীয়। সেখানে প্রেমেরসংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লেখা রয়েছে। ইদানীং উল্লিখিত কাহিনী অবলম্বনে স্থানীয়শিল্পীদের নিয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচিত্রও নির্মিত হয়েছে।

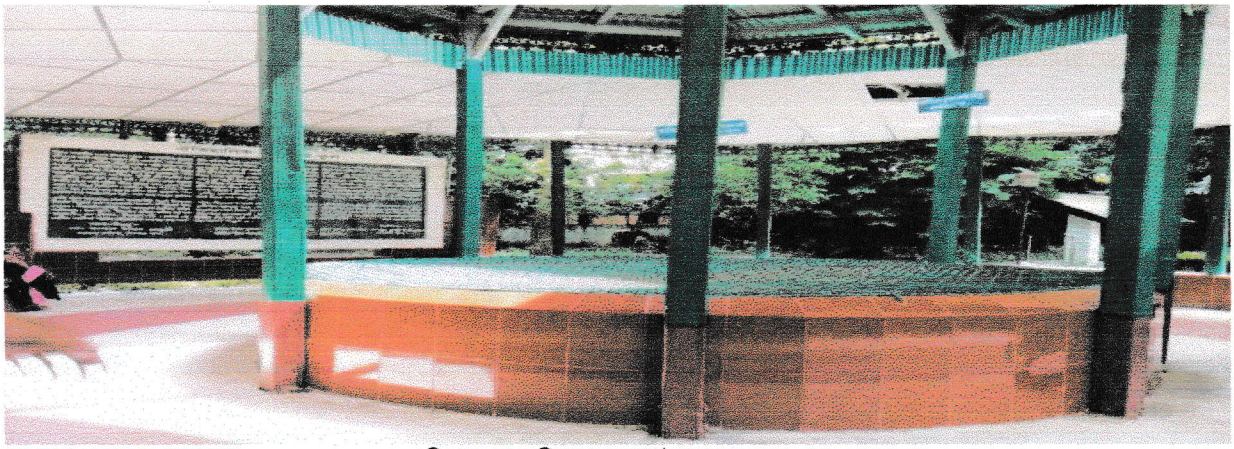

ছবি-৬৩: মাথিনের কুপ, টেকনাফ, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
খ) গাড়ী পার্কিং নাই
গ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঘ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৭.৩। শাহপরীর দ্বীপ (টেকনাফ)

নাফ নদীর মোহনায় বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। প্রথম ইংরেজ-বর্মী যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা এই দ্বীপের দাবি করে। শাহপরীর দ্বীপ টেকনাফের সর্ব দক্ষিণে ভূ-ভাগের খুবই নিকটবর্তী একটি দ্বীপ, যা টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নে অবস্থিত এবং টেকনাফ উপজেলার উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। শাহপরীর দ্বীপের বাম পাশে নাফ নদী বয়ে গেছে যা বাংলাদেশকে মিয়ানমার থেকে বিভাজন করেছে। এর নামকরণ সম্পর্কে কেউ বলেন সম্রাট শাহ সুজার 'শাহ' আর তার স্ত্রী পরীবানুর 'পরী' মিলিয়ে নামকরণ হয়েছিল এই দ্বীপের, কারো মতে 'শাহ ফরিদ' আউলিয়ার নামে দ্বীপের নাম করণ হয়েছে। অপরদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি সা'বারিদ খাঁ'র 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্য গ্রন্থের অন্যতম চরিত্র 'শাহপরী'। [তথ্যস্বাধীনতার আগে শাহপরীর দ্বীপের আয়তন ছিল দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১০ কিলোমিটার। বর্তমানে তা ছোট হয়ে দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার ও প্রস্থ ৩ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এই দ্বীপের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।সড়কপথে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ ৮৯ কিলোমিটার এবং টেকনাফ থেকে শাহপরীর দ্বীপের দূরত্ব ১৩ দশমিক ৭০ কিলোমিটার[১০]।

ছবি-৬৪: শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
খ) গাড়ী পার্কিং নাই
গ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঘ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
চ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৭.৪। টেকনাফ ট্রানজিট পয়েন্ট জেটিঘাট

টেকনাফের পৌরসভার চৌধুরী পাড়ায় নাফ নদীর তীরে নির্মিত ৫৫০ মিটার দীর্ঘ ট্রানজিট জেটির উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে টেকনাফের পর্যটন শিল্পে সুবিধা সেন্টমার্টিনে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল এবং মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য সুবিধা বাড়ানোর লক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) প্রায় ৩১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে জেটিটি নির্মাণ করে। এ জেটিতে বিশ্রামাগার, শৌচাগার ও সাতটি সিঁড়ি রয়েছে। এছাড়াও জেটি ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে জেটিটির সম্মুখভাগে ৯০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬০ মিটার প্রস্থের গাড়ি পার্কিং স্পট রাখা হয়েছে। ট্রানজিট চালু হলে এ জেটির কারণে দু'দেশের মানুষের জন্য চলাচলে অনেক সুবিধা বাড়বে। *জেটিটি ইতোমধ্যেই পর্যটকদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। দৃষ্টিনন্দন এ জেটিতে পর্যটক এবং স্থানীয় লোকজনের আনাগোনা এখন* চোখে পড়ার মতো। ট্রানজিট চালু হলে দু'দেশের লোকজনের পারাপারের সুবিধা তো আছেই, পাশাপাশি টেকনাফে নতুন একটি বিনোদনের ক্ষেত্র তৈরি হলো[১১]।

ছবি-৬৫-৬৬: টেকনাফ ট্রানজিট পয়েন্ট জেটিঘাট, টেকনাফ, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৭.৫। সাবরাং ইকো টুরিজ্যম

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নে অবস্থিত। যার আয়তন ১ হাজার ৪৭ একর। পার্কটি ঢাকা থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ৮২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মেরিন ড্রাইভের মাধ্যমে সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে।

অপরদিকে, সাবরাং পর্যটন অঞ্চল থেকে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে কম সময়ে যাওয়া যাবে, পথও কিছুটা পরিবর্তিত হবে। কারণ, এখন টেকনাফের দমদমিয়া থেকে সেন্ট মার্টিনে জাহাজে যেতে সময় লাগে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। সাবরাং পর্যটন অঞ্চল চালু হওয়ায় মাত্র আধা ঘণ্টায় যাওয়া যাবে সেন্ট মার্টিনে। ফলে একজন পর্যটক তখন কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত দেখার পর সাবরাং পর্যটন অঞ্চল ও সেন্ট মার্টিন একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাবেন।কক্সবাজারের সীমান্ত উপজেলা টেকনাফে সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের কাজ এগিয়ে চলেছে। সমুদ্র সৈকতের পাড়ে এই ট্যুরিজম পার্কটি ১ হাজার ৪৭ একর জমির উপর থাইল্যান্ডের পাতায়ার সৈকতের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই পার্কটির চলমান কাজ শেষ হলে প্রতিদিন সেখানে দেশি-বিদেশি ৪০ হাজার পর্যটক যাতায়াত করতে পারবেন। সাবরাং এই পর্যটন অঞ্চল চালু হলে এখান থেকে মাত্র আধা ঘণ্টায় যাওয়া যাবে প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত দেখার পর পর্যটকরা সাবরাং পর্যটন অঞ্চল ও সেন্টমার্টিন অল্প সময়ে দেখার সুযোগ পাবেন।

কক্সবাজারের কলাতলী থেকে টেকনাফের যেখানে গিয়ে মেরিন ড্রাইভ শেষ হয়েছে, তার পাশেই ১ হাজার ৪১ একর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে সাবরাং পর্যটন অঞ্চল। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের পাড়ে টেকনাফের সাবরাংকে থাইল্যান্ডের পাতায়ার আদলে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন অঞ্চলে রূপ দেয়ার কাজ চলছে পুরোদমে।সাবরাং এই পর্যটন অঞ্চল হবে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা পর্যটন অঞ্চল। বিনিয়োগ হবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। সেখানে থাকবে পরিবেশবান্ধব শহর, সুন্দরবনের থিম পার্ক ও নাইট সাফারি, রয়্যাল ক্যাসিনো, গলফ ক্লাব, অ্যাকোয়ারিয়াম, জাদুঘর, হেরিটেজ পার্ক, শপিং মল, রেস্টুরেন্ট, ক্লাবসহ অন্যান্য সুবিধা। এছাড়া থাকছে ১০০ শয্যার হাসপাতাল এবং একটি স্কুলও।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনটি তারকা হোটেল নির্মাণের কাজ শুরুর মধ্যদিয়ে সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। গ্রেট আউটডোর অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার লিমিটেড, গ্রিন অরচার্ড হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেড এবং সানসেট বে লিমিটেড নামের তিনটি প্রতিষ্ঠান ৫.৫ একর জমিতে ৩২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৫৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে পাঁচ তারকা ও তিন তারকা মানের হোটেলসহ পর্যটনবান্ধব বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের এই কাজ করছে বলে জানা গেছে।এছাড়া ৯টি পর্যটনবান্ধব প্রতিষ্ঠানের আরও ২১২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার কথা রয়েছে। এই বিনিয়োগকারীর তালিকায় নেদারল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের দুটি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। পাতায়ার আদলেই হচ্ছে সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক। আর এখানে প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারবে ৪০ হাজার পর্যটক। বর্তমানে এই পর্যটন অঞ্চলের প্রশাসনিক ভবন ও ভূমি উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা বাঁধ, সেতু-কালভার্ট তৈরিসহ বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড চলছে[৮]।

সমস্যা সমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৭.৬। টেকনাফ অভয়ারন্য

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পূর্বনাম:টেকনাফ গেম রিজার্ভ বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ বন। এর আয়তন ১১,৬১৫ হেক্টর। বাংলাদেশে হাতে গোনা যে কয়েকটি স্থানে বন্য হাতির দেখা মেলে তার মধ্যে টেকনাফ গেম রিজার্ভ অন্যতম। বন্য এশীয় হাতির অভয়ারণ্য হিসাবে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। টেকনাফ গেম রিজার্ভের অবস্থান কক্সবাজারের টেকনাফে।[৩] যথেষ্ট

বিস্তীর্ণ এই গেম রিজার্ভে বন ছাড়াও আছে নাইটং পাহাড়, কুদুম গুহা, কুঠি পাহাড় প্রভৃতি আকর্ষণীয় স্থান। বনের উঁচু পাহাড় আর বঙ্গোপসাগরের মাঝে রয়েছে বিশাল গর্জন বন। আছে ১০০০ ফুট উঁচু তৈঙ্গা চূড়া। প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে আছে ফুল, ফল, বাহারি গাছ। সড়ক পথে সহজ যোগাযোগের কারণে পর্যটকদের কাছে এটি একটি আকর্ষনীয় ভ্রমণ স্থান।টেকনাফ গেম রিজার্ভ বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় টেকনাফ উপদ্বীপে অবস্থিত। কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন জুড়ে এর বিস্তৃতী; এ ইউনিয়ন গুলো হল - বাহারছড়া, হ্নীলা, সুবরাং, টেকনাফ এবং হোয়াইক্যং।কক্সবাজার শহর থেকে এর দূরত্ব ৪৮ কিলোমিটার। এই গেম রিজার্ভের পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নাফ নদী; এর ঠিক পরপরই মায়ানমার সীমান্ত এবং পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগর।টেকনাফ গেম রিজার্ভ একটি সরল পাহাড় শ্রেনীর অংশ, যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ৭০০ মিটার। এই গেম রিজার্ভের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ২৮ কিলোমিটার এবং প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার।সংরক্ষিত বনের ১১,৬১৫ হেক্টর জায়গা নিয়ে ১৯৮৩ সালে টেকনাফ গেম রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কক্সবাজার (দক্ষিণ) বন বিভাগের তিনটি ফরেষ্ট রেঞ্জঃ হোয়াইক্যং, শীলখালী এবং টেকনাফ এর ১০ টি ব্লক এ গেম রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত। বন্য এশীয় হাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। গেম রিজার্ভের বড় অংশ পাহাড়ি মৃত্তিকা গঠিত। পূর্ব পাশে নাফ নদীর তীর ঘেষে আছে জোয়ার ভাটায় সৃষ্ট কাদা মাটির ম্যানগ্রোভ বন। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে আছে বালুকাবেলা গঠিত সৈকত।টেকনাফ গেম রিজার্ভ জীব বৈচিত্রে ভরপুর এবং এই বনের জীববৈচিত্রকে বাংলাদেশের মধ্যে সবার্ধিক বলে ধারণা করা হয়। এই বনে ২৯০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৫৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২৮৬ প্রজাতির পাখি, ৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৩ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে।পাখির মধ্যে আছে ছোট কানাকুবো, নীলকান বসন্তবাউরি, বড়হলদেঝুঁটি কাঠকুড়ালী, এশীয় দাগি কুঁটি পেঁচা, কালাগলা টুনটুনি, লালমৌটুসী ইত্যাদি।টেকনাফ বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যে সাময়িকভাবে বিচরণকারী এশীয় হাতির দেখা পাওয়া যায়। যেটি বাংলাদেশের বুনো হাতির একটি বড় অংশ। এখানে বাস করা বাংলাদেশে বুনো মোট হাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় রামকুত্তা, উল্লুক, সম্বর হরিণ, উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী, সজারু প্রভৃতি প্রাণীরও দেখা মেলে।

ছবি-৬৭: কুদুম গুহা, টেকনাফ, কক্সবাজার

টেকনাফ গেম রিজার্ভের কয়েকটি প্রধান আকর্ষণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুদুম গুহা। জানামতে এটি বাংলাদেশের একমাত্র বালু-মাটির গুহা। কুদুম গুহায় প্রচুর বাদুড় বাস করে, তাই এটি বাদুর গুহা নামেও পরিচিত। কুদুম গুহায় দুই প্রজাতির বাদুড় থাকে। শুধু তাই নয়, বাদুর ছাড়াও এই গুহায় বাস করে ৪ প্রজাতির শামুক, গুহার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরিতে থাকে ৪ প্রজাতির মাছ আর আছে তিন প্রজাতির মাকড়শা। গুহার বাইরে থেকে পাখিদের এসে গুহার শামুক খেতে দেখা গেছে। প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় ইকোট্যুরিজমের স্থান হিসাবে কুদুম গুহার গুরুত্ব ব্যাপক[১০]।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই

ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৭.৭। গর্জণ বন

শীলখালী রেঞ্জের আওতায় জাহাজপুরা গর্জন বাগানটি দু'শত বছরের পুরনো একটি বাগান। কক্সবাজার দক্ষিণ অঞ্চলে শুধুমাত্র জাহাজপুরাতে সৌন্দর্য ভরা গর্জন বাগানটি সঙ্গে আছে বৈলাম, জারইল, তেসসল, সাপালি, শীল করল, ওরি আম গাছ। এই বাগানটি পর্যটকদের কাছে অতন্ত্য প্রিয় এবং বিনোদনের জন্য রয়েছে অফুরন্ত ব্যবস্থা। বাগানের ভেতর সারি সারি ভাবে দাড়িয়ে আছে গাছগুলো। বাগানের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের ওপরের উঠলে দেখা যায় সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য। কক্সবাজার শহর থেকে মেরিন ড্রাইভ সড়ক দিয়ে ৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব পাশে মাথা উঁচু করে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গর্জন বাগান। যার এক একটির বয়স দু'শত বছর পেরিয়ে গেছে। এর আয়তন ১১,৬১৫ হেক্টর। এই বাগানে ৫ হাজার ৭৭২টিরও বেশি গর্জন গাছ রয়েছে। গাছগুলোর দৈর্ঘ্য ৭০ থেকে ৮০ ফুট এবং প্রস্থ ১০ থেকে ১২ ফুট হবে।এছাড়াও বাগানে রয়েছে হাতি, রেসাস বানর, শুক রাকার ভোঁদর, নীলদাড়ি সুইচোরা, বড় কাঠ কুড়ালি, কাকড়াভুক, বানর, হরিণ জীববৈচিত্র্য সহ ১৩ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৫৬ প্রজাতির সরিসৃপ, প্রায় ২৬০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী পাখি ও ৫৫ প্রজাতির প্রাণী। বাগানটি পর্যটকদের কাছে আরও আকৃষ্ট করে তুলতে নিরাপত্তাসহ পর্যটকদের বিশ্রাম, বিনোদন ও ইকো ট্যুর গাইডের ব্যবস্থা রেখে এই বাগানকে 'প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র' হিসেবে উদ্বোধন করা হয়। অনেকে আবার এই বাগানকে 'জাহাজপুরা ইকো পার্ক' বলেও অবিহিত করেন। জাহাজপুরা গর্জন বাগানসহ কুদুম গুহা ও পাহাড়ি এলাকা দেখতে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা এখানে আসেন। এই গর্জন বাগানের ভেতর প্রবেশ করলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আওয়াজসহ বন্য প্রাণী দেখা যায়। ফলে পর্যটকদের কাছে এটি সুন্দর ও আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে ইদানীং পাহাড়ের ভেতরের বিভিন্ন অপহরণের ঘটনার কারণে পর্যটকদের সংখ্যা কিছুটা কমছে।

ছবি-৬৮: গর্জণ বন, জাহাজপুরা, টেকনাফ, কক্সবাজার

এই বাগানকে ঘিরে এখানে একটা ছোট পার্ক নিয়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দেশি বিদেশি পর্যটকরা ওই বাগানে বেড়াতে যান। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য বন-বিভাগের সদস্যদের পাশাপাশি ইকো ট্যুর গাইড ও স্থানীয় সিপিজি সদস্যরা রয়েছে [১০] ।

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

৩.৭.৮ নাফ নদীর মোহনাঃ

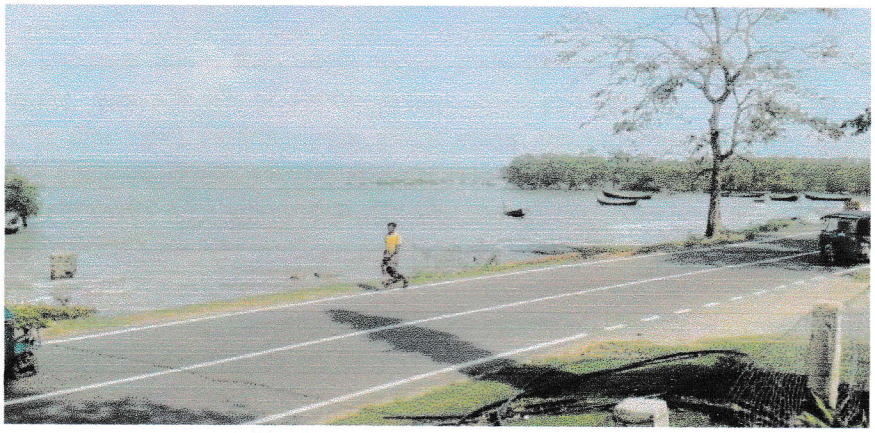

ছবি-৬৯: নাফ নদীর মোহনা, টেকনাফ, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই

৩.৭.৯ জালীয়ার দ্বীপঃ

ছবি-৭০-৭১: জালীয়ার, টেকনাফ, কক্সবাজার

সমস্যাসমূহঃ

ক) সন্ধার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।
খ) বিনোদনের অন্য কোন অবকাঠামো নাই
গ) গাড়ী পার্কিং নাই
ঘ) দর্শনীয় স্থান হিসেবে কোন প্রচারনা নাই
ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল
চ) আবাসিক ব্যবস্থা নাই
ছ) মনিটরিং এর জন্য একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই

অধ্যায়-০৪. কক্সবাজার এ পর্যটন সমস্যা সমূহঃ

বর্তমানে দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থার কারণে পর্যটকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অধিকাংশ পর্যটক সড়ক পথে যাতায়াত করে থাকে, সড়ক ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কক্সবাজার পৌঁছা যায় না। সড়ক পথে রাস্তার ওপর অসংখ্য হাটবাজার, ট্যাক্সি, ট্যাম্পো, বাসস্ট্যান্ড থাকায় এখানে নিত্য যানজট লেগে থাকে। যানজটের মধ্যে পড়ে পর্যটকরা দুর্ভোগের শিকার হন। সড়ক পথে যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচলের ব্যাপারে হাইওয়ে পেট্রোল পুলিশের কোনো তৎপরতা দেখা যায় না। বর্তমানে কক্সবাজার সড়ক পথে অবাধে ধীর গতির টমটম চলার কারণে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া এই সড়কে বেপরোয়া যানবাহন চলাচল করার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। অধিকাংশ সড়ক সরু হওয়ার কারণে যানবাহনগুলোকে বিপজ্জনকভাবে চলাচল করতে হয়। এছাড়াও কিছু কিছু সমস্যা সচিত্র এখানে তুলে ধরা হলোঃ

ক) যাত্রী/ পর্যটক হয়রানীঃ বাস থেকে নামলেই যে কে দালালদের দ্বারা হয়রানীর স্বীকার হন

ছবি-৬৯: বাস থেকে নামার পর দালাল কর্তৃক যাত্রী হয়রানী, কক্সবাজার

খ) ফুটপথ/রাস্তায় বেওয়ারিশ পশুপাখির চলাচলঃ
কক্সাবাজার শহরে ফুটপথ বা রাস্তা দিয়ে হাটার সময় গরু, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি বেওয়ারিশ প্রানীর দেখা পাওয়া যায়।

ছবি-৭০: বেওয়ারিশ পশু, ডলফিন মোড়, কক্সবাজার

গ) যত্রতত্র ময়লা আবর্জনাঃ

ককআসবাজার জেলার সকল দর্শনীয় স্থানে ময়লা আবর্জনা দেখা পাওয়া যায়। এগলি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন জন্য কোন ব্যক্তি পা্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ খুব একটা দেখা যায়না। শুধুমাত্র পৌর শহর এলাকায় সীমিত অঅকারে পরিচ্ছন্ন কার্ক্রম আছে।

ছবি-৭০: ময়লা আবর্জ্যনা, ডলফিন মোড়

ছবি-৭০: ময়লা আবর্জ্যনা, হিমছড়ি পাহাড়, রামু

ঘ) বীচে হকার ভিক্ষুক, ক্যামেরা ম্যান, ঘোড়সওয়ার এর উৎপাতঃ

কক্সবজার এ বেড়াতে এ যেকেউ বীচে এলে হকার, হিজড়া, ভিক্ষুক, ঘড়োওয়ালা, বীচ বাইকার, ক্যামেরাম্যান দ্বারা হয়রানীর স্বীকার হন।

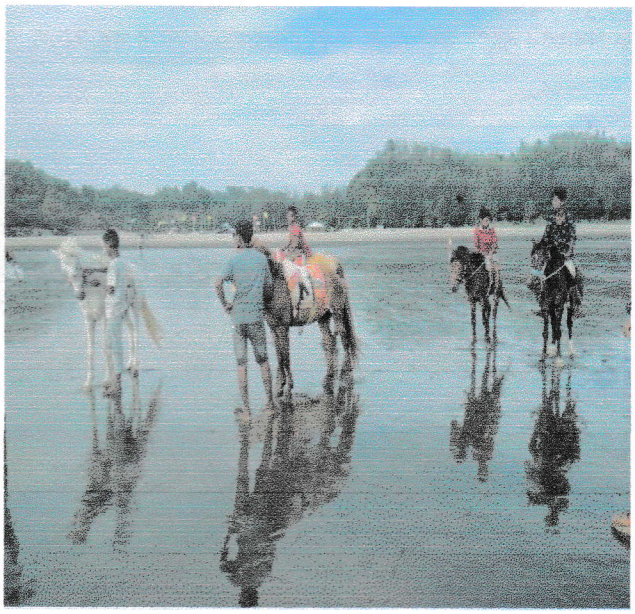

ছবি-৭১-৭২: হকার ও ঘোড়সওয়ার এর উৎপাত, সুগন্ধা ও হিমছড়ি, কক্সবাজার

ঙ) হোটেল রুম ভাড়া ও খাদ্য মূল্য অনির্দিষ্ট:

কক্সবাজার শহরে ভাল মানের অধিকাংশ হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট এর ভাড়া এবং খাবার মূল্য তালিকা নির্দিষ্ট করা নাই। অধিকাংশ হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট নিজিদের মত করে েএ তালিকা নির্ধারণ করে এবং এ মূল্য তালিকা নির্ধারনে সরকারের কোন অনুমোদন নেওয়া হয়না।

ছবি-৭২: হোটেল ভাড়া

চ) অবকাঠামো সমস্যাঃ কক্সবাজার জেলায় উন্নত মানের অবকাঠামো সমস্যা রয়েছে। জেলার সকল দর্শনীয় স্থানে টেকসই আবাসন,নিরাপত্তা, যোগাযোগ অবকাঠামোর সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি।

ছ) বেসরকারী বিনিয়োগের অভাবঃ কক্সবাজারে দেশী ও বিদেশী বিননিয়োগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

জ) অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণঃ কক্সবাজার এ কোন পরিকল্পনা ছাড়া অবকাঠামো নির্মান একটি চলমান সমস্যা

ঞ) পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত একক সরকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবঃ কক্সবাজার এ পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় কাজ করে এমন কোন একক সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই।

অধ্যায় -৫: Key Informant Interview এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

৫.১ হোটেল কর্তৃপক্ষঃ

কক্সবাজারের হোটেল মালিক দের Key Informant Interview করা হয় মোট ৫০ টি হোটেল এ Interview পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিচে বর্ণনা করা হলো।

ছবি-৭৩: Key Informant Interview, লং বীচ হোটেল, কক্সবাজার

১। পর্যটকের(শহরের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা) সচেতনতা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা/গাইডলাইন আছে কি না? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৭
না	৯৩

অধিকাংশ হোটেলে এর পর্যটকের(শহরের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা) সচেতনতা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা/গাইডলাইন নাই। এর ফলে পর্যটকেরা যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সমস্যার কারেনে ছিনতাই এর শিকার, িএবং গোসলে নেমে মৃত্যুর শিকার হয়।

২। বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা কেমন ? তাদের কোন গাইডের ব্যবস্থা?

বিবরণ	শতকরা হার
দেশি	৯৯
বিদেশী	১

কক্সবাজার এ বিদেশী পর্যটক আসে না বললেই চলে । যেসব বিদেশী এখানে আসে মূলত কর্মসূত্রে এখানে অবস্থান করে।

৩। হোটেলেকাজের দ্বারা পর্যটন সংক্রান্ত বিকশিত হয়? হ্যা /না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৯
না	১

মূলত দেশীয় পর্যটকেরা এখানে ঘুরতে আসে, ফলে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয় এবং এ খাত বিকশিত হয়।

৪। হোটেলে নিজস্ব STP কোন ব্যবস্থা আছে কি? হ্যা /না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	২
না	৯৮

কক্সবাজার এ বড় ১০ টি হোটেল ছাড়া অধিকাংশ হোটেলৈ STP এর কোন ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই।

৫। হোটেলে নিজস্ব septik tank কোন ব্যবস্থা আছে কি?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮৫
না	১৫

কক্সবাজার এ হোটেল গুলির ৮৫ % এর নিজস্ব septik tank কোন ব্যবস্থা আছে।

৬। পানি সরবরাহ নিজস্ব ভূ গর্ভঃ ?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

হোটেল গুলিতে শতভাগ নিজস্ব ভূগর্ভস্থ পানি সা্পলাই বিদ্যমান। ফলে লবনাক্ততার একটা ঝুকি আছে।

৭। গাড়ী পার্কিং আছে কি ?হ্যা/না?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	২০
না	৮০

কক্সবাজার এ ২০ % হোটেল এর সীমিত আকারে গাড়ী পার্কিং আছে।

৮। রেন্ট এ কার এর ব্যবস্থা আছে?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮৮
না	১২

কোন ট্যুরিস্টগাড়ী ভাড়া করতে চাইলে অধিকাংশ হোটেল রেন্ট এ কার এর ব্যবস্থা করে দেয়।

৯। আপনার মতে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

হোটেল মালিকদের মতে কক্সবাজার এ ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

১০। পাবলিক টয়লেট পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

হোটেল মালিকদের মতে কক্সবাজার এ পাবলিক টয়লেট সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

১১। ডাস্টবিন পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

হোটেল মালিকদের মতে কক্সবাজার এ ১১। ডাস্টবিন সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

১২। ড্রেনেজ, রাস্তা,ফুটপথ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত?হ্যা/না/মোটাভালো

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৩৫
না	৫৪
মোটামটি	২১

কক্সবাজার এ ড্রেনেজ, রাস্তা,ফুটপথ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কক্সবাজার শহরে মোটামুটি এবং ভাল ক্বি শহরের বাইরে ভাল নয়।

১৩। চেঞ্জিং রুম পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার

হ্যা	০
না	১০০

সৈকতে গোসলের পর চেঞ্জিং রুম দরকার হয় এটি কক্সবাজার এ পর্যাপ্ত নয়।

১৪। সন্ধ্যার পর বিনোদনের জায়গা কোন গুলি?

বিবরণ	শতকরা হার
বীচ/মার্কেট	৭৬
হোটেল	২৪

সন্ধ্যার পর বীচ, মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ছাড়া বিনোদনের আর অন্য কোন জায়গা বিদ্যমান নাই।

১৫। বীচ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মনে ? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮৫
না	১৫

কক্সবাজার শহরের বীচ মোটামটি পরিস্কার কিন্তু সন্টধার পর বীচ এ অনেক ময়লা থাকে। ১২০ কিঃ মিঃ বীচের শুধমাত্র ৫ কিঃ মিঃ এলাকা জুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্ক্রম চালানো হয়।

১৬। ফুটপথ/রাস্তায় পাগল/ভবঘুরে/মানসিক প্রতিবন্ধী/পশুপাখি

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৩
না	৭

কক্সবাজার শহরে পাগল, ভবঘুরে, মানসিক প্রতিবন্ধী, গরু, ছাগল, ঘোড়া, ইত্যাদি সচরাচর দেখা যায়।

১৭। বীচে কোন হকার/ভিক্ষুকের/বাদাম/কফি বিক্রেতার/হিজড়া উৎপাত আছে কি না? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

কক্সবাজার বীচে কোন হকার,ভিক্ষুক, বাদাম,কফি বিক্রেতা, হিজড়া উৎপাত অত্যধিক পরিমানে আছে।

১৮। হোটেল স্টাফদের পযটন এর উপর ট্রেনিং/ডিগ্রি আছে? মোট স্টাফ/ট্রেনিং প্রাপ্ত

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮
না	৯২

কক্সবাজার এ অধিকাংশ হোটেল স্টাফদের পযটন এর উপর ট্রেনিং/ডিগ্রি নাই।

১৯। পর্যটন বিকাশে একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

হোটেল মালিকদের মতে কক্সবাজার এ পর্যটন বিকাশে একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অবশ্যই প্রয়োজন।

৫.২ Key Informant Interview(টুরিস্ট) এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

কক্সবাজারের আগত টুরিস্ট দের হোটেল মালিক দের Key Informant Interview করা হয় মোট ৫০ জনের **Interview** পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিচে বর্ণনা করা হলো।

ছবি-৭৪: **Key Informant Interview(টুরিস্ট), হোটেল কল্লোল, কক্সবাজার**

১। আপনার ঘোরাঘরির স্থান কোথায়?স্থান : লাবনী,সুগন্ধা,কলাতলী, হিমছড়ি, দরিয়ানগর, ইনানী,টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, দরিয়ানগর, রামু, মহেশখালী মন্দির, দুলাহাজরা সাফারী পার্ক ইত্যাদি

বিবরণ	সংখ্যা	দর্শনীয় স্থান সংখ্যা
সর্বোচ্চ ভ্রমনের স্থান	১২	৫০ টি
সর্ব নিম্ন ভ্রমনের স্থান	৬	

সর্বোচ্চ ভ্রমনের স্থান ১২ টি। সাধারনত পর্যটকেরা ১২ টি স্থানে ঘোরাঘরি করে। অন্যান্য স্থানে যায়না কারণ নিরাপত্তার অভাব, অবকাঠামো সমস্যা, প্রচার প্রচারণার অভাব।

২। হোটেল বুক? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০
না	৯০

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে সরাসরি হোটেলে অবস্থান করে।

৩। হোটেল ভাড়া নিয়ে দরকষাকষি?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১৩
না	৮৭

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোটেল ভাড়া নিয়ে পর্যটকেরা দরকষাকষি করে থাকে।

৪। ভ্রমনের ধরণ?বিনোদন/অফিসিয়াল

বিবরণ	শতকরা হার
বিনোদন	৯১
অফিসিয়াল	৯

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে আসে বিনোদনের জন্য।

৫। সচেতনতামূলক লিফলেট/প্রচারণা?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে কোন ধরনের সচেতনতামূলক লিফলেট/প্রচারনা পায়না।

৬। স্থনীয়ভাবে বাহন ব্যবহারের হয়রানী/ভাড়া বেশি নিয়েছে ?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৩
না	৭

স্থানীয় ব্যবহারিত যানবাহনগুলি অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে তারা মনে করেন।

৭। বাস হতে নামার পরওয়াশরুমের সুবিধা?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৪
না	৯৬

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে বাস হতে নামার ওয়াশরুমের সুবিধা পায় নি।

৯। পাকেটজাত খাবার?চিপস/কফি/চকলেট?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৫
না	৫

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে পাকেটজাত খাবার গ্রহণ করে থাকে

১০। ব্যবহারের পর কোন ডাস্টবিন পেয়েছেন?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৩
না	৯৭

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে পাকেটজাত খাবার গ্রহনের পর কোন ডাস্টবিন পায়নি।

১১। ফুটপথ/রাস্তায় ময়লা দেখা পেয়েছেন?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৭৪
না	২৬

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে ফুটপথ/রাস্তায় ময়লা দেখা পেয়েছেন।

১২। রাস্তায় চলাচলের ভবঘুরে/ পাগল/মানসিক প্রতিবন্ধী/?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮০
না	২০

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে রাস্তায় চলাচলের ভবঘুরে, পাগল, মানসিক প্রতিবন্ধীর, দেখা পেয়েছেন।

১৩। সন্ধ্যার পর কোন জায়গায় গিয়েছেন?বীচ/মার্কেট

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮০
না	২০

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশ কক্সবাজারে এসে সন্ধ্যার পর বীচ/মার্কেট ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা পায়নি।

১৪। হিজড়া/হকার/বিক্ষুক/বাদাম/চা বিক্রেতা কতৃক হয়রানী?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

আগত পর্যটকেরা সবাই কক্সবাজারে এসে সন্ধ্যার পর হিজড়া/হকার/বিক্ষুক/বাদাম/চা বিক্রেতা কতৃক হয়রানীর স্বীকার হয়েছেন।

১৫। কিট কট /জেট স্ক/ঘোড়া/বাইক ব্যবহার?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

আগত পর্যটকেরা সবাই কক্সবাজারে এসে কিট কট /জেট স্ক/ঘোড়া/বাইক ব্যবহার করেছেন।

১৬। ব্যবহারে সন্তুষ্ট কি না?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯২
না	৮

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশই কক্সবাজারে এসে হোস্ট কমিউনিটির ব্যবহারে তুষ্ট নয়।

১৭। সৈকতে গোসলের পর কোন চেঞ্জিং রুম পেয়েছেন কি না?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৪
না	৬

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশই কক্সবাজারে এসে সৈকতে গোসলের পর কোন চেঞ্জিং রুম পায়নি।

১৮। বীচে ময়লা আবর্জনা দেখছেন কি না?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৪
না	৬

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশই কক্সবাজারে এসে সৈকতে বীচে ময়লা আবর্জনা দেখেছেন।

১৯। কক্সবাজার শহরের রাস্তা/ফুটপথ কেমন?ভাল/খারাপ/মোটামটি?হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৪
না	৬

আগত পর্যটকেরা অধিকাংশই কক্সবাজারে এসে কক্সবাজার শহরের রাস্তা/ফুটপথ মোটামুটি ভাল বলেছেন।

৫.৩ Key Informant Interview (পরিবহন অফিস) এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

কক্সবাজারের দূরপাল্লার যাত্রীবাহি বাস কাউন্টার ম্যানেজারদের Key Informant Interview করা হয় মোট ২৫ টি কাউন্টারে এ **Interview** পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

ছবি-৭৫: **Key Informant Interview (রবি এক্সপ্রেস, পরিবহন অফিস), কক্সবাজার**

১। টুরিস্ট ঘুরতে যায় এমন স্থান গুলির নাম ও সংখ্যা?

বিবরণ ভ্রমনের স্থান	সংখ্যা	দর্শনীয় স্থান সংখ্যা
সর্বোচ্চ	১৪	৫০ টি
সর্ব নিম্ন	৬	

২। যাত্রী পরিবহনের সময় র সচেতনতা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা/গাইডলাইন দেওয়া হয় কি না?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

কক্সবাজার এ পর্যটক পরিবহনের সময় র সচেতনতা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা/গাইডলাইন দেওয়া হয় না

৩। বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা কেমন ?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১
না	৯৯

আগত পর্যটকের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যা খুবই নগন্য।

৪। গাড়ী কোথায় পার্কিং করা হয়?কেন্দ্রীয় টাঃ/নিজস্ব পার্কিং/রাস্তায়

বিবরণ	শতকরা হার
কেন্দ্রীয় টার্মিনাল	২০
নিজস্ব পার্কিং	১০
রাস্তায়	৭০

কক্সবাজার শহরে গাড়ী পার্কিং এর জায়গা খুবই অপ্রতুল । অধিকাংশ গাড়ী রাস্তাই পার্কিং করা হয়।

৫। পরিবহনের শাখা/এজেন্ট কাউন্টার আছে?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৯৬
না	৪

অধিকাংশ গাড়ীর শাখা/এজেন্ট কাউন্টার আছে । মূলত এগলি হোটেল গুলির পার্কিং স্পেস ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে এবং এ কারনে যেখানে সেখানে যাত্রী পরিবহনের জন্য গাড়ী পার্কিং করা হয় এবং শহর জুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়।

৬। গাড়ী হতে টুরিস্ট/যাত্রী নামার পর হোটেলে যাওয়ার পূর্বে দালাল কতৃক হয়রানী হয় কি না?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটক গাড়ী হতে নামার পর হোটেলে যাওয়ার পূর্বে দালাল কতৃক হয়রানী শিকার হয়।

৭। আপনার মতে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক পর্যাপ্ত কি না?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক পর্যাপ্ত নয়।

৮। পাবলিক টয়লেট পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে পাবলিক টয়লেট সুবিধা পর্যাপ্ত নয়।

৯। ডাস্টবিন পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে ডাস্টবিন পর্যাপ্ত সুবিধা পর্যাপ্ত নয়।

১০। ড্রেনেজ, রাস্তা,ফুটপথ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৬৪
না	৩৬

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে ডাস্টবিন পর্যাপ্ত সুবিধা শুধু মাত্র কক্সবাজার পৌরসভা এলাকায় মোটামটি ভাল।

১১। সৈকতে গোসলের পর চেঞ্জিং রুম পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	০
না	১০০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে ডাস্টবিন পর্যাপ্ত সুবিধা শুধু মাত্র কক্সবাজার পৌরসভা এলাকায় মোটামটি ভাল।

১২। সন্ধ্যার পর বিনোদনের জায়গা কোন গুলি?

বিবরণ	শতকরা হার
বীচ/মার্কেট/হোটেল	৫৮
না	৪২

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে সন্ধ্যার পর বীচ, মার্কেট ও হোটেল ছাড়া বিনোদনের অন্য কোন জায়গা বিদ্যমান নাই।

১৩। বীচ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মনে ?

বিবরণ	শতকরা হার	
হ্যা	৬৭	
না	৩৩	

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে বীচ পরিস্কার থাকে তবে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যার পর অপরিস্কার থাকে ।

১৪। ফুটপথ/রাস্তায় পাগল/ভবঘুরে/মানসিক প্রতিবন্ধী/পশুপাখি দেখা যায়?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	৮০
না	২০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে ফুটপথ/রাস্তায় পাগল/ভবঘুরে/মানসিক প্রতিবন্ধী/পশুপাখি দেখা যায়।

১৫। বীচে কোন হকার/ভিক্ষুকের/বাদাম/কফি বিক্রেতার/হিজড়া উৎপাত আছে কি না? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	০

কক্সবাজার এ আগত পর্যটকদের মতে বীচে কোন হকার/ভিক্ষুকের/বাদাম/কফি বিক্রেতার/হিজড়া উৎপাত আছে

৫.৪ Key Informant Interview(KII),সরকারী কর্মকর্তা এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

কক্সবাজারের কর্মরত সরকারী অফিসারদের Key Informant Interview করা হয় মোট ২৫ টি জনের **Interview** পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিচে বর্ণনা করা হলো।

ছবি-৭৫: KII,অতিঃজেলা মাজিট্রেট, কক্সবাজার

ছবি-৭৬:KII,সহকারী পুলিশ সুপার, টুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার

১। অফিসের কার্যাবলীতে পর্যটন সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা/গাইডলাইন আছে ?

বিবরণ	সংখ্যা	পর্যটন সংক্রান্ত অফিস
হ্যা	৬	১. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ২. জেলা প্রশাসকের অফিস ৩. ট্যুরিস্ট পুলিশ ৪. কক্সবাজার পৌরসভা ৫. বন বিভাগ ৬. কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃপক্ষ
না	৭৯	

৩। অফিসের কাযাবলিতে পরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে কি?

বিবরণ	সংখ্যা
হ্যা	৬
না	৭৯

কক্সবাজার এ পর্যটন নিয়ে নিজ অফিসের কাজের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে কাজে করে এমন প্রতিষ্ঠান ০৬ টি

৪। পর্যটন কক্সবাজারের পর্যটন সম্ভাবনা বেশী/কম ?

বিবরণ	সংখ্যা
হ্যা	৮৫
না	০

সকল সরকারী অফিসের কর্মকর্তারা মনে করে কক্সবাজারর এর পর্যটন সম্ভাবনা অনেক বেশী

৭। আপনার মতে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক পর্যাপ্ত কি না?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

সরকারী অফিসের কর্মকর্তাদের মতে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক পর্যাপ্ত

৮। ট্যুরিস্ট দূর্ব্যবহারের/ হয়রানীর শিকার হয় কি না?টমটম/সিএনজি/হোটেল/রেস্টুরেন্ট/হকার/ফটোগ্রাফার কর্তৃক

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	১০০
না	

ট্যুরিস্ট দূর্ব্যবহারের/ হয়রানীর শিকার হয় তবে লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৯। পাবলিক টয়লেট পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার এ পাবলিক টয়লেট এর সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়

১০। ডাস্টবিন পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার এ ডাস্টবিন এর সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়

১১। ড্রেনেজ, রাস্তা,ফুটপথ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও পরিচ্ছন্ন?হ্যা /না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	২৫
না	৭৫

কক্সবাজার শহর এলাকায় ড্রেনেজ, রাস্তা,ফুটপথ ব্যবস্থা মোটামটি পর্যাপ্ত ও পরিচ্ছন্ন।

১১। চেঞ্জিং রুম পর্যাপ্ত কিনা? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার শহর এলাকায় কয়েকটি চেঞ্জিং রুম আছে কিন্তু পর্যাপ্ত জেলার অন্যান্য বীচ এলাকাতে নাই বললেই চলে।

১২। সন্ধ্যার পর বিনোদনের জায়গা কোন গুলি?বীচ/শপিং/ফিশওয়ার্ল্ড

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার শহর এলাকায় সন্ধ্যার পর বিনোদনের জায়গা কোন গুলি বীচ,শপিং,ফিশওয়ার্ল্ড ইত্যাদি কিন্তু জেলার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে সন্ধ্যার পর বিনোদনের কোন জায়গা নাই।

১৩। বীচ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মনে ? হ্যা/না/মোটামটি

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার শহর এলাকায় বীচ দিনের বেলায় মোটামটি পরিস্কার কিন্তু সন্ধ্যার পর একটু অপরিস্কার থাকে। জেলার অন্যান্য সকল বীচ এলাকায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নাই।

১৪। ফুটপথ/রাস্তায় পাগল/ভবঘুরে/মানসিক প্রতিবন্ধী/গরু ,ছাগল ,কুকুর, ঘোড়া,

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার শহর এলাকায় ফুটপথ/রাস্তায় পাগল/ভবঘুরে/মানসিক প্রতিবন্ধী/গরু ,ছাগল ,কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদি দেখা যায়।

১৫। বীচে কোন হকার/ভিক্ষুকের/বাদাম/কফি বিক্রেতার/হিজড়া উৎপাত আছে কি না? হ্যা/না

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার জেলার বীচে হকার/ভিক্ষুকের/বাদাম/কফি বিক্রেতার/হিজড়াদের যথেষ্ট উৎপাত আছে

১৬। বিশ্বমানের পর্যটন স্থান করতে করনীয় একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান?

বিবরণ	শতকরা হার
হ্যা	
না	১০০

কক্সবাজার কে বিশ্বমানের পর্যটন স্থান তৈরী করতে একক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অবশ্যই প্রয়োজন

অধ্যায়-০৬: সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ মালা

৬.১ Key Informant Interview হতে প্রাপ্ত সুপারিশ যা কক্সবাজার কে বিশ্বমানের পর্যটন স্থান গড়ে তুলতে সহায়তা করবেঃ

১) একক সরকারী অফিস প্রতিষ্ঠাঃ পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য একক সরকারী অফিস প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে
২) রুম ভাড়া নিয়ন্ত্রনঃ কক্সবাজারে এ কিছু ভাল মানের হোটেল ছাড়া কারও রুম ভাড়া নির্দিষ্ট নয়। এজন্য রুম ভাড়া নির্ধারন করা প্রয়োজন
৩) ট্রেনিং ইনইস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাঃ পর্যটন এর সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠান এর কর্মীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে
৪) খাদ্য সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রনঃ সকল হেটেল রেস্টুরেন্টে খাবার দাম ও পরিমান নির্ধারণ করতে হবে।
৫) স্থানীয় টুরিস্ট পরিবহন ব্যবস্থা চালুঃ কক্সবাজার এ টুরিস্ট পরিবহনের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
৬) যত্রতত্র হোটেল নির্মান নিয়ন্ত্রন: কক্সবাজার বীচ সংলগ্ণ এলাকা অনিয়ন্ত্রিতভাবে হোটেলে নির্মান করা হচ্ছে। এ সব নির্মান কাজ পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে।
৭) যেখানে দোকানঘর নির্মান বন্ধঃ কক্সবাজার বীচ সংলগ্ণ এলাকার সৌন্দর্য হানী বন্ধের জন্য যেখানে সেখানে দোকান ঘর নির্মান বন্ধ করতে হবে।
৮) বিভিন্ন পার্ক প্রতিষ্ঠাঃ কক্সবাজার এলাকায় চিত্ত বিনোদনের জন্য তেমন কোন পার্ক নাই। বিভিন্ন অত্যাধুনিক পার্ক নির্মান করে বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯) নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নঃরোহিঙ্গা সমস্যার কারনে পর্যটনের উন্নতিতে যেন ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য সমগ্র জেলা ব্যাপি টুরিস্ট পুলিশের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল স্থানে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে
১০) আকর্ষনীয় পর্যটন স্থানঃ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যটন স্থান গুলোকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে।
১১) যোযোগ সমন্বয়ঃ যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তথা বিমান, নৌ ও সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করতে হবে।
১২) আবাসন সুবিধাঃ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য সকল দর্শনীয় স্থানে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
১৩) প্রতিবন্ধী, দূর্বল, বৃদ্ধদের জন্য সৈকতে সরাসরি প্রবেশের পথ তৈরী করতে হবে।
১৩)রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাঃ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিরসনে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে

৬.২ জাতীয় নীতি মালা অনুযায়ী কক্সবাজারে পর্যটন বিকাশে সুপারিশ মালাঃ

আগামী দিনগুলোতে শিব জুড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অমিত সম্ভাবনাময় কক্সবাজার কে একটি বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী পর্যটন স্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক) সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক পর্যটন উন্নয়ন

পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, রিজার্ভ ফরেস্ট, বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান, কেনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিনস ও সোনাদিয়া দ্বীপসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকত ও দ্বীপসমূহকে কেন্দ্র করে আদর্শ অবকাশ পর্যটন গন্তব্য সৃষ্টি, সৈকতভিত্তিক বীচ ফুটবল/ভলিবল, সার্ফিংসহ সমুদ্র সৈকতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক মানের রিসোর্টসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি। সমুদ্র সৈকত সমৃদ্ধ পর্যটন স্পটসমূহের বিকাশ ও দ্রুত যোগাযোগের জন্য কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ এবং পর্যটন সম্পৃক্ত রেল, বিমান ও সথল যোগাযোগসহ বিমান বন্দরের উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে।

খ) প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন উন্নয়ন

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্বিক স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে প্রত্নতাত্বিক পর্যটন উন্নয়ন। প্রত্নতাত্বিক স্থানসমূহকে যথাযথ প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রত্নতাত্বিক অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক

মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয়করণ।

গ) নৌ-পর্যটন ও গ্রামীন পর্যটন উন্নয়ন

কক্সবাজারের বিশাল সাগর জলপথ, দেশীয় গ্রামীণ জীবনধারার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিদেশিদের কাচে আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক পর্যটন-আকর্ষণ হিসেবে গণ্য। সমুদ্রপথে ভ্রমেণের জণ্য নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন জলযানের ব্যবস্থা করে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের নৌ ভ্রমণে আকৃষ্ট করা ও নদী তীরবর্তী আকর্ষণীয় স্থানসমূহে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে

ঘ) ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন

কক্সবাজারের বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থস্থানসূহ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, সুফী সাধকের মাজার, মহোশখালির আদিনাথ, কুতুবাগ দরবার শরীফ, রাংকুট, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি বিভন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা যেতে পারে।

ঙ) সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বর্ণার্ঢ্য মধ্যে দিবস, মেলা পার্বন ও কর্মকান্ডকে ঘিরে সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন। একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, পৌষ উৎসব, গ্রামীন মেলা, উপজাতীয় উৎসব ও নবান্ন উৎসবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিদেশি পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন এবং দেশীয় পরিবেশ-বান্ধব ঐতিহ্যবাহী যানবাহন পর্যটন-আকর্ণষ হিসেবে উন্নয়ন।

চ) অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভ্রমণে সক্ষমতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক পর্যটক আকর্ষণের ধারা সূচিত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ ভ্রমণে আগ্রহ সৃষ্টি ও অভ্যন্তরীন পর্যটন উন্নয়নের জণ্য স্বল্পমূল্য আবাসন সুবিধাদিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ; প্রধান প্রধান ধর্মীয় এবং পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান গুলোতে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের জন্য স্লপ ভাড়ায় আবাসিক ব্যবস্থাদি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই শিল্পের জন্য বেসরকারি খাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ) যুব পর্যটন উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ যুব পর্যটন উৎসাহিত করার জন্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুলভে বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ ট্যুর, শিক্ষা সফর ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জ) কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন

স্থানীয় জনগোষ্ঠির সহায়তায় পর্যটন-আকর্ষণসমূহ সংর্কষণ ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। আকর্ষনীয় স্থানসমূহের সংস্কৃতিকর্মীদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে টিম গঠন এবং আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের লক্ষ্যে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের জন্য উৎসাহিতকরণ। বিদেশি পর্যটকদের জন্য কমিউনিট হোম-সেট অপারেশনের ব্যবস্থা গ্রহণে করে স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র-নৃ-জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে তরুণ-তরুণীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরি লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ।

ক্রীড়া পর্যটন

বাংলাদেশের পর্যটনে খেলাধূলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অর্ন্তভুক্তিতে বিশ্বের ক্রীড়ামোদী পর্যটকদের এ দেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এ লক্ষ্যে ক্রীড়া পর্যটনকে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলা এখানে আয়োজন করা যেতে পারে।

৬.৩ উপসংহারঃ

নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরপুর কক্সবাজার জেলা।পর্যটন শিল্পে কক্সবাজার এর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কক্সবাজার পর্যটন শিল্পকে আরো উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। প্রতিবছর দেশ ও বিদেশ হতে লাখ লাখ মানুষ এখানে ঘুরতে আসে। ১২০ বঃ কিঃ মিঃ সমূদ্র সৈকত, পাহাড়, সাগর, দ্বীপ, মেরিণ ড্রাইভ, ঝরনা, ইত্যাদি কারনে কক্সবাজার বাংলাদেশে অন্যতম আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র।

বাংলাদেশের পর্যটনে প্রচলিত চিন্তাচেতনার বাইরে একটু দেশীয় ছোঁয়া দিতে পারলে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশই এমন, একটু চেষ্টা করলে সারা দেশটাকেই পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা অনেকেই যেখানে জন্মেছি, তার পাশের উপজেলা বা জেলাতে যাইনি; কিন্তু একটা পর্যটন স্পট থাকলে সহজেই মানুষ আশেপাশের জেলাগুলোতে বেড়াতে যেতে পারতো। অনেক বেসরকারি ট্যুর অপারেটর এসব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করলেও নানা মাত্রায় পর্যটন শিল্পের সার্বিক ভাবনা ও বিকাশে বাংলাদশ পর্যটন কর্পোরেশনকেই এগিয়ে আসতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে আমরা ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৩ লাখ ৭৩ হাজার মানুষ এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৩.১ ভাগ। দেশের পর্যটন স্থানগুলোকে যদি সঠিকভাবে এ শিল্পের আওতায় আনা যায় তাহলে কর্মসংস্থান আরো বৃদ্ধি পাবে। বিদেশী পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জণও বেড়ে যাবে। আবার বিশ্বে বাংলাদেশের সৌন্দর্য্য, নৈসর্গিকতার ইতিহাস ছড়িয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বে উজ্জ্বল হবে।সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে বিকাশ ঘটাতে পারি পর্যটন শিল্পের। আমরা সম্মিলিতভাবে যদি প্রচেষ্টা চালাই তাহলে অচিরেই পর্যটন শিল্পে কক্সবাজার বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিবে।

৭.০ তথ্যসূত্রঃ

১. Cited in : https://m.dailyinqilab.com/article/63886: accessed on 17 February 2023

২. Cited in: https://www.ukhiyanews.com/ accessed on 17 April 2023

৩. বা/এ বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতিঃ গ্রন্থমালা কক্সবাজার,২০১৪

৪. www.coxda.gov.bd accessed on 1 June April 2023

৫. https://www.coxsbazar.gov.bd/bn/site/tourist_spot accessed on 25 April 2023

৬. https://www.daily-bangladesh.com/tourism

৭. https://www.kalerkantho.com/feature/a2z/ accessed on 30 April 2023

৮. https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ accessed on 29 August 2022

৯. পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়(২০০৪), সেন্টমার্টিনস দ্বীপ

১০. https://bn.wikipedia.org/wiki accessed on 25 August 2022

১১. https://www.banglanews24.com accessed on 21 March 2023

১২. https://m.dailyinqilab.com accessed on 20 may August 2023

কক্সবাজার এর পর্যটন সম্ভাবনা ও সমস্যা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২৩